সুশীলকুমার দাশগুপ্ত

গ্রীক পুরাণের গল্প

সুশীল কুমার দাশগুপ্ত

ভিতরের ছবি এঁকেছে লেখক পুত্র

শ্রীমান সুপর্ণ কুমার দাশগুপ্ত বয়স ১০

অয়ন প্রকাশন

৪ নিমাই বোস লেন ▫ কলিকাতা-৬

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

শ্রীমান সুপর্ণকে

বাবা

পরিবেশক

রূপম

প্রথম প্রকাশ ২৪শে ডিসেম্বর '৮৩ □ প্রকাশিকা শ্রীমতী শিখা কর □
 □ ছেপেছেন শান্তিনাথ প্রেস কলিকাতা-৬

□ প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত □ দাম—১২'০০

সূচীপত্র

ভূমিকা

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীগুলি আমাদের হিন্দু পুরাণ কথার মতো একত্রে সংগৃহীত হয় নি কখনও। প্রাচীন গ্রীসের চারণ কবিরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেব-দেবী ও মহানায়কদের কাহিনী শুনিয়ে গান করত। যুগ পরম্পরায় এই কাহিনীগুলি লোকমুখে ফিরতে ফিরতে গ্রীসের কাব্যকাহিনীর উপজীব্য বিষয় হয়ে যায় ক্রমশ। হোমার তাঁর আখ্যানমূলক মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড ও অডিসিতে গ্রীক দেব-দেবী ও মহানায়কদের কিছু কিছু উল্লেখ করে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হন। পরবর্তীকালে দেব-দেবীদের বিবর্তন ইতিহাস নিয়ে হেসিয়ডের লেখা কাব্য-আলেখ্য 'থিওজনি'তে গ্রীসের দেব-দেবী ও মহানায়কদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রীসের এই সকল পুরাণকথা থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বিন্যস্ত করে পরিবেশন করেছি বর্তমান গ্রন্থে।

গ্রন্থটি প্রকাশ করে শ্রীমতী শিখা কর আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার পুত্র শ্রীমান সুপর্ণ কুমার দাশগুপ্ত গ্রন্থের ভিতরের ছবি এঁকেছে।

সুশীল কুমার দাশগুপ্ত

১লা আগস্ট, ১৯৮৩
১০, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ
দমদম। কলিকাতা-৭০০ ০২৮

সূর্যদেবতার রথে ফিটন

সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর ছেলে ফিটন প্রতিদিন লক্ষ্য করে, তাঁর পিতা যুদ্ধ-রথে সূর্যকে নিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমা করে মহা-দিগন্তে। প্রতিদিন ভোরে উঠে সবার আগে পিতার রথের যাত্রাপর্ব অবলোকন করে সে—ভোরের আকাশে পশ্চিমের উদ্দেশে পিতার রথের পাড়ি দেওয়া আর সন্ধ্যার আকাশে পশ্চিম দিগন্তে সেই রথের ডুব দেওয়া পর্যবেক্ষণ করে সে অপার বিস্ময়ে। দুটি ঘোড়া মহা-বিক্রমে সূর্যদেবতার রথকে টেনে নিয়ে ছোটে বিদ্যুদ্বেগে আর মহাশক্তিধর সূর্যদেবতা এ্যাপোলো তেজী সেই দুরন্ত ঘোড়া দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। সূর্যদেবতার মহিমায় পূব থেকে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের এই অন্তহীন পরিক্রমা।

পৃথিবীসহ ন'টি গ্রহ আলোকিত করার কঠিন দায়িত্ব থেকে এক পল সময়ও ছুটি নেওয়ার উপায় ছিল না বলে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র ফিটনের সঙ্গে দেখা করার সময় পান নি বহুদিন। বন্ধুদের কাছে ফিটন তার পিতা সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর কথা বলে—মহাকাশের বুকে তার পিতার রথ পাড়ি দিয়ে চলেছে কালচক্রে—একথা গর্ব করে বলে সে

বন্ধুদের। কিন্তু তার এক বন্ধু সখেদে বলল তাকে একদিন, 'এ্যাপোলোর সম্বন্ধে তুমি যাই বল না কেন, তিনিই যে তোমার পিতা এটা কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায় না। কেননা, সূর্যদেবতার অনন্ত শক্তির এককণাও তোমার মধ্যে দেখতে পাই না।' একথায় ব্যথিত হয়ে মার কাছে গিয়ে অনুযোগ করে ফিটন যে বন্ধুরা বিশ্বাস করে না যে সে এ্যাপোলোর পুত্র। মা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তুমি প্রকৃতই এ্যাপোলোর ছেলে। তুমি যদি আমার কথায় অবিশ্বাসই কর তাহলে পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য সূর্যের প্রাসাদে অভিযানের সংকল্প করতে হবে তোমাকে।' ফিটন তখন মাকে জিজ্ঞেস করল কিভাবে সে সূর্যদেবতার প্রাসাদে যাবে। 'পূব দিগন্তে যেখানে আকাশ আর মাটি মিশেছে এক রেখায়, সেখানে যেতে হবে তোমাকে।'—মা বললেন তাকে।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ফিটন সূর্যের দেশে রওনা হল। দিন-রাত, মাসের পর মাস হেঁটে চলে ফিটন। অবশেষে সূর্যদেবতার প্রাসাদে এসে উপস্থিত হল ফিটন।

আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে এই প্রাসাদের চূড়া। স্বর্ণমণ্ডিত এই প্রাসাদ থেকে সুতীব্র দ্যুতি ঠিকরিয়ে এসে ধাঁধিয়ে দিল ফিটনের চোখকে। ফিটন প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বিশাল এক কক্ষে এসে উপস্থিত হল। সেই কক্ষে দেখল সে এক দীর্ঘদেহী জ্যোতিস্মর পুরুষ সিংহাসনে বসে আছেন। অপরূপ সাজে সজ্জিত সেই পুরুষ। সোনার সুতোয় গাঁথা ফুল আর লতা পাতায় চিহ্নিত জমকালো পোশাক তাঁর গায়ে। সেই পুরুষটির সোনার মুকুট থেকে ঠিকরে আসছে আলোর ঝলকানি—অত তীব্র আলো সহ্য করতে না পেরে বুজে এল ফিটনের চোখ। ফিটন বুঝল এই তার পিতা সূর্যদেবতা এ্যাপোলো।

সূর্যদেবতার সিংহাসনের পাশে চামড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর। এ্যাপোলোর নজর পড়ল ফিটনের ওপর, তিনি তাঁর মুকুটটিকে মাথা থেকে সরিয়ে রাখলেন, পাছে মুকুটটির দীপ্তিতে

ফিটন অন্ধ হয়ে যায়। এ্যাপোলো এক পলক দেখেই চিনতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্র ফিটনকে ; জন্মাবার পর যদিও তিনি একবার ছাড়া তাকে আর দেখেন নি, কিন্তু তার মাথায় লাল ফুলের গোছ দেখেই মুহূর্তে চিনে ফেলেছিলেন তাকে।

এ্যাপোলো ফিটনকে সাদরে ডেকে বললেন, 'এস আমার পুত্র। বল আমায়, কেন আমার প্রাসাদে এসেছ তুমি। স্টিক্স নদীর নামে শপথ নিচ্ছি যে তুমি আমার কাছে যা চাইবে, পাবে। (গ্রীক দেবতারা যখন নরকের নদী স্টিক্সেনের নামে কোন শপথ নেন, তখন সে শপথ হয় চূড়ান্ত তার অন্যথা কিছু করার উপায় থাকে না তাঁদের।)

ফিটন তার পিতার কাছে প্রার্থনা জানাল—'পিতা, আপনি আমাকে শুধুমাত্র একটি দিনের জন্য আপনার রথ চালাতে দিন।"

ফিটনের এই প্রার্থনা শুনে বিমর্ষ হয়ে গেলেন এ্যাপোলো। তিনি পুত্রকে অনুরোধ করে বললেন, 'অন্য কিছু চাও আমার কাছে। দেবতাদের মধ্যে সূর্যরথ চালানোর ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে, অন্য কোন দেবতা সে ক্ষমতার অধিকারী নয়। সময় সময় আমার নিজের পক্ষেই এই কাজ দুরূহ বলে মনে হয়। তুমি সেরকম শক্তিশালী নও তাই একাজ করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে।'

কিন্তু ফিটনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা জিদ চেপে গিয়েছিল। সূর্যদেবতার রথ চালিয়ে একবার যদি সে আকাশ প্রদক্ষিণ করতে পারে, তাহলে বন্ধুদের কাছে মাথা উঁচু থাকবে তার ; তখন বুঝবে তারা সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর উপযুক্ত পুত্র সে। এই চিন্তা থেকেই ফিটন পিতার কাছে সূর্য-রথ চালাবারই প্রার্থনা জানাল, অন্য কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে পিতার কাছে আসে নি সে, তাও বলল। এ্যাপোলো তাকে বললেন, 'তুমি একটি সামান্য বালক। তুমি জান না, তুমি কি চাইছ। যে ঘোড়াগুটির ওপর নির্ভর করে আমি সূর্য-রথ চালিয়ে নিয়ে যাই, তারা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির বন্য পশু—প্রচণ্ড তেজী ও অসাধারণ একমাত্র আমি ছাড়া বেপরোয়া প্রকৃতির এই দুর্ধর্ষ

ঘোড়াদুটিকে কেউই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। যে পথে আমি রথ চালিয়ে নিয়ে যাই সে পথ অতি উত্তুঙ্গ, তুমি যদি একবার সেখান থেকে নীচে পৃথিবীর দিকে চোখ নামাও, তাহলে সর্বশরীরে শিহরণ জাগবে তোমার এবং টাল সামলাতে না পেরে মহাশূন্য থেকে বহু নীচে মাটিতে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরও বললেন তিনি, 'সূর্যের অন্তরীক্ষ-পরিক্রমার পথটির কোন নির্দেশ দেখতে পাবে না তুমি। তোমাকেই পথের নিশানা ঠিক করে নিতে হবে। তুমি যদি নির্দিষ্ট পথ থেকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পৃথিবীর দিকে নেমে যাও তাহলে সূর্যের আগুনের হলকায় পৃথিবী জ্বলে পুড়ে যাবে, আবার যদি তুমি নির্দিষ্ট পথ থেকে উপরে উঠে যাও, তাহলে গ্রহ তারার সঙ্গে তোমার রথের সংঘর্ষ হবে অবধারিতভাবে; পৃথিবী থেকে সূর্যরথের দূরত্ব যতটা থাকা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি দূরে চলে যায় যদি সেটি তাহলেও বিপদ, পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যাবে। সুতরাং সূর্য-রথ চালানো মহাঝুঁকির ব্যাপার হবে তোমার কাছে। তোমার তো বটেই, পৃথিবীর সর্বনাশও ডেকে আনবে তুমি। অন্য কিছু চাও আমার কাছে, সূর্য-রথ চালানোর অভিলাষ সরিয়ে ফেল মন থেকে।' ফিটন তার প্রার্থনায় অবিচলিত থাকল, বলল সে, 'পিতা, আপনার রথ একদিনের জন্য আমাকে চালাতে দিন! কোন চিন্তা নেই আপনার, সতর্ক থাকব আমি প্রতিক্ষণ।'

এ্যাপোলো আর ফিটন চুপ করে গেলেন যখন উষাদেবী সূর্যের প্রাসাদের দ্বার খুলতে শুরু করলেন। সময়ের ঘণ্টা এবার এ্যাপোলোর রথের সঙ্গে তাঁর ঘোড়া দুটিকে জুড়ে দিল। সময় এখন প্রস্তুত। ফিটনও তার কথায় অনড়। সূর্য-দেবতা তখন তাঁর মাথার স্বর্ণমুকুট ফিটনের মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি মনে-প্রাণে চাই না যে তুমি সূর্য-রথ চালাও। কিন্তু যেহেতু আমি স্টিক্স নদীর নামে শপথ নিয়েছিলাম যে তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করব তাই আমি বাধ্য হলাম তোমার এই অসাধ্য সাধনের প্রয়াসে অনুমতি দিতে। রথে চড়ার আগে একটি জরুরী কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করবে, ঐ পথ থেকে অন্যদিকে ঘুরবে না, উঁচুতে বা নীচুতে যেতে দেবে না ঘোড়াছটিকে। যাত্রা তোমার শুভ হোক, এই কামনা করি।'

সময় নিশানা দিল। ফিটন পিতাকে অভিবাদন জানিয়ে রথে উঠে বসে সজোরে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিয়ে একেবারে আলগা করে দিল, দ্রুতগতিতে রথটি চালাবার জন্যে। ঘোড়াছটি চলতে শুরু করেই বুঝল আজ কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে রথে—রথটি কিছুটা হালকা বোধ হল তাদের কাছে। সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর শরীরের ভারের সঙ্গে তারা পরিচিত, আজ অপেক্ষাকৃত কম ওজনের কেউ রথে বসেছে, তা তারা বুঝতে পেরে পিছন ফিরেই ছাখে, এ্যাপোলো রথে নেই, তার পরিবর্তে একটি ছোট ছেলে রয়েছে।

শরীরে যত শক্তি ছিল তাই দিয়ে ফিটন ঘোড়াছটিকে সূর্যের নির্দিষ্ট পথে ছুটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘোড়াছটিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা তার সাধ্যের বাইরে ছিল। ঘোড়াছটি ক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশে বেপরোয়াভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। সূর্যের নির্দিষ্ট পথ থেকে অনেক নীচে নেমে চলল তারা, নীচে ফিটনের চোখ এক পলক পড়তেই শিউরে উঠল সে। তারপর ঘোড়াছটি দিক পরিবর্তন করে ওপরে উঠতে লাগল—পাড়ি দিল জ্যোতিষ্কলোকে। নক্ষত্রমণ্ডলীর নিজেদেরই আলো রয়েছে এর ওপর যদি সূর্যের বিধ্বংসী আগুন তাদের ওপর এসে পড়ে, তাহলে তাদের অস্তিত্বই রাখা দায়। হলোও তাই, সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের সংঘর্ষে নক্ষত্রেরা একে অপরের ঘাড়ে এসে পড়তে লাগল। জ্যোতিষ্কলোকে বিধ্বংসী আগুন ছড়িয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ঘোড়াছটি তখন গোঁত মেরে মহাশূন্যের তলদেশে পাড়ি দিল উর্ধ্বশ্বাসে। মাথা নীচে স্থির রেখে এক ছুট দিয়ে পৃথিবীর মাথায় কালো মেঘের মাঝে এসে পড়ল। জলভরা মেঘ সূর্যের প্রচণ্ড তাপে শুকিয়ে উবে গেল। বৃষ্টির অভাবে বিশুষ্ক হয়ে গেল পৃথিবী। আরও নীচে নেমে এল ফিটনের রথ। সূর্যের আগুনের হল্কা এসে পড়ল পৃথিবীতে—জ্বলে উঠল পৃথিবীর

বুকে আগুন। মাঠে মাঠে শস্য পুড়ে হল নিশ্চিহ্ন। গাছগাছালি, তৃণখেত ছাই হয়ে নির্মূল হল ঝলসে পুড়ে। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেল বহু মানুষের গায়ের চামড়া।

ফিটন চেষ্টার কোন কসুর করল না ঘোড়ার লাগাম প্রাণপণ মোচড় দিয়ে টেনে রথকে উপরে নির্দিষ্ট পথে নিয়ে যেতে, কিন্তু ঘোড়া-দুটিকে ফেরাতে পারল না সে।

ফিটনের পিতা এ্যাপোলো অলক্ষ্যে থেকে সবই দেখছিলেন। জ্বলন্ত পৃথিবীকে দেখে তিনি দেবরাজ জুপিটারের কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'হে মহান শক্তিধর জুপিটার, বাঁচাও পৃথিবীকে। পৃথিবীকে ধ্বংস হতে দিও না।'

জুপিটার এ্যাপোলোর আবেদনে সাড়া দিয়ে ফিটনের দিকে বজ্র-বিদ্যুৎ ছুঁড়ে দিলেন, ফিটন বজ্রাহত হয়ে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পৃথিবীর মাটিতে পড়ে গেল। পৃথিবীর মানুষের কাছে মনে হল যেন আকাশ থেকে একটি নক্ষত্র ঠিকরে এসে পড়েছে মাটিতে।

সূর্য-রথের ঘোড়াদুটির উন্মত্ততা মুহূর্তে ছুটে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তারা এখন শূন্য-রথ নিয়ে ঘরের উদ্দেশে রওনা হল।

সূর্য-দেবতা এ্যাপোলো তাঁর সিংহাসনে বসে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন পুত্রের শোকে। পুত্রের এই গতি হবে জেনেই তিনি পুত্রকে সূর্য-রথ চালানো থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছিলেন। কিন্তু উচ্ছ্বাসপ্রবণ ফিটন শোনেনি সেকথা। এ্যাপোলোর কান্না আর থামে না।

সারথীবিহীন সূর্যরথের নিজ আলয়ে ফিরে আসার পরই রাত্রি নেমে এল পৃথিবীতে। অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। উত্তপ্ত পৃথিবী হল ঠাণ্ডা তখন। নক্ষত্রেরা স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে পেয়ে পৌঁছে গেল আপন আপন কক্ষপথে। কালো মেঘ উঁকি দিল আবার আকাশে, বৃষ্টি নেমে এল পৃথিবীতে অঝোরে, নিভল আগুন, শান্তি বারিতে সিঞ্চিত হল পৃথিবীর মানুষ।

থিসিউসের কাহিনী

থিসিউস তার মায়ের সঙ্গে তার মাতামহের প্রাসাদে বাস করত ছোট একটি রাজ্যে। তার মাতামহই সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন। সে অনেক কাল আগের কথা।

থিসিউস যখন ষোল বছরে পড়ল তার মা এথরা তাকে একটা প্রাচীন মন্দিরের কাছে নিয়ে এলেন। সমুদ্রের বাঁকে একটি পাহাড়ের মাথায় সেই মন্দির। দূরে দেখা যায় এ্যাটিকা এবং তার সুন্দর শহর এথেন্সকে।

এথরা মন্দিরের কাছে গিয়ে ছেলেকে বললেন, 'তুমি আজ ষোল বছরে পড়লে, তোমার মত ভাল ছেলে কোন মা আজ পর্যন্ত পায় নি। তাই থিসিউস, তোমাকে মানুষের মত মানুষ হতে হবে। প্রকৃত মানুষের উপযুক্ত কাজ করতে হবে তোমাকে।'

থিসিউস বলল, 'মা, আমি কি করে মানুষের মত মানুষ হব?'

এথরা নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন—একটা বিষণ্ন ছায়া নেমে এল তার মুখে। থিসিউকে বললেন তিনি, 'মন্দিরের বাগানে ঐ

যে পুরোনো গাছটিকে দেখছ, ঐ গাছের গোড়ার কাছে একটি পাথর চাপা আছে। পাথরটি তুলে যা পাবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

থিসিউস গাছটির গোড়ায় গিয়ে ঘনঘাসে ঢাকা একটি জায়গায় সেই পাথরের সন্ধান পেল। পাথরটিকে সে তুলতে গেল কিন্তু কিছুতেই সেটাকে তুলতে পারল না। মায়ের কাছে খালি হাতে এসে বলল, 'মা আমি পাথরটা তুলতে পারলাম না। আমার ধারণা, এদেশে কারোর এমন শক্তি নেই যে এই পাথর তুলতে পারে।'

মা বললেন তাকে, 'ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন। একদিন আসবে যখন তুমি এই দেশে সকলের চেয়ে শক্তিশালী হবে। তুমি আর এক বছর অপেক্ষা কর।'

লেখাপড়া শুরু করে দিল থিসিউস জোর কদমে। মানুষ তাকে হতেই হবে, বিদ্যালয়ে তার জ্ঞান-অনুশীলন শুরু হল ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থিসিউস নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

এক বছর পরে থিসিউস যখন সতের বছরে পড়ল, তার মা তাকে পাহাড়ের ওপর সেই পুরোনো মন্দিরের কাছে নিয়ে গিয়ে পাথরটিকে তুলতে বললেন। পাথরটাকে আগের বারের মত এবারও তুলতে পারল না সে। কিন্তু মাকে সে কথা দিল, পরের বার সে যথার্থ মানুষ হয়ে পাথরটাকে তুলে তার নিচে রাখা জিনিসটিকে মার কাছে নিয়ে আসবেই। মা তাকে আশীর্বাদ করলেন।

সেই বছর থিসিউস অক্লান্ত পরিশ্রম করল। সে যখনই সুযোগ পেত জঙ্গলে শিকার করতে যেত। পাহাড়ের উপর আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ পরিভ্রমণ করে শক্তসবল করল নিজের পা-দুটিকে। জঙ্গল থেকে শিকার করে জীবজন্তুদের পিঠের ওপর বয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরত নিজের শরীরটাকে লোহার মত শক্ত করতে। শক্তিমান মানুষের সঙ্গে শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামত শরীরে বল সঞ্চয়ের জন্য। এবারে এক বছরের মধ্যে থিসিউস এমন বলশালী হল যে, সেদেশে তার জোড়া শক্তিমান পুরুষ কেউ আর থাকল না।

থিসিউস যেদিন আঠারো বছরে পড়ল তার মা তাকে নিয়ে

পাহাড়ের ওপর সেই পুরোনো মন্দিরে গেলেন। থিসিউস মন্দিরটির কাছে গিয়ে মাকে বলল, 'শরীর পাত করেও আজ আমি পাথরটাকে তুলবই।'

থিসিউস পাথরটিকে প্রাণপণ তোলার চেষ্টা করল। একটু একটু করে পাথরটা নড়তে লাগল। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে পাথরটাকে এবারে সে তুলে ফেলল। পাথরটির নিচে দেখল সে, রঙিন পাথরখচিত একটি তরোয়াল আর তার পাশে রয়েছে একজোড়া সোনার পাদুকা। থিসিউস সেই তরোয়াল আর পাদুকাদুটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে মাকে দিল। সেগুলি তার কাছ থেকে নিয়ে মা তাকে সঙ্গে করে পাহাড়ের উপর আরও উঁচুতে উঠল। সেখান থেকে মা তাকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন দূরে এ্যাট্টিকা রাজ্যের দিকে। মা থিসিউকে বললেন, এই এ্যাট্টিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর এথেন্স রয়েছে। সূর্যকরোজ্জ্বল মনোরম এই এ্যাট্টিকার মাঠে মাঠে ফলে নানা শস্য, ফুলে ফলে ভরা এই এ্যাট্টিকা দেশ মানুষের স্বর্গ। খেত প্রান্তরে সবুজের খেলা—পশুপাখিদের মুক্তভূমি। পাহাড়ের গর্ভে আছে সোনা রূপো অঢেল। থিসিউস তুমি যদি এই দেশের রাজা হতে তাহলে তুমি কি করতে বলতো।'

'আমি যদি এ্যাট্টিকার রাজা হই, দেশ শাসন করব আমি বিজ্ঞতার সঙ্গে। মানুষের জন্য থাকবে আমার অকৃত্রিম ভালবাসা। মানুষের সেবায় উৎসর্গ করব নিজেকে। আমি যখন মারা যাব, সকলে বলবে তখন উচ্ছ্বসিতভাবে, 'হ্যাঁ, থিসিউসের মত ভাল রাজা আর হবে না।'

থিসিউসের মা মনে মনে খুশী হয়ে ছেলেকে বললেন, 'এই তরোয়াল আর পাদুকাটি নিয়ে তুমি ঐ দেশে যাও। এ্যাট্টিকার রাজা হলেন তোমার পিতা ইজিয়াস। নানা অশান্তির মধ্যে আছেন তিনি, তাঁর পাশে তোমার থাকা দরকার। একজন শক্তিশালী মানুষ হিসাবে তুমি তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারবে। মিডিয়া নামে এক ডাইনীর খপ্পরে পড়েছেন তোমার পিতা। অনেকদিন

আগে সুন্দর শহর এথেন্সকে ছেড়ে চলে যেতে হয় আমাকে। ঐ ডাইনী আমার ছেলেকে মারতে চেয়েছিল। জান থিসিউস, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে না এলে আমি আর তোমার বাবা চিরতরে হারাতাম তোমাকে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ছেলেকে আমি সুযোগ্য শক্তিধর পুরুষ হিসাবে মানুষ করে পাঠিয়ে দেব তার পিতার কাছে, বিপদে সাহায্য করতে তাঁকে। তোমাকে নিয়ে আসার সময় রাজার তরোয়াল আর সোনার পাদুকাদুটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তরোয়াল হাতে নাও থিসিউস, সোনার পাদুকা পরে এখনই এথেন্সে চলে যাও।'

মার আশীর্বাদ নিয়ে তাঁকে বিদায় জানিয়ে ঈশ্বরের উপর ভরসা করে মাকে রেখে থিসিউস পিতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এথেন্সে রওনা হলেন।

থিসিউস প্রথমে সমুদ্রপথে এথেন্সে যাওয়া মনস্থ করল। পরে ঠিক করল সমুদ্রপথে যাবে না সে। ঝুঁকিবহুল স্থলপথে নিজের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় যদি সে দিতে পারে পিতার কাছে, যোগ্য সন্তান বলে তাকে মনে করবে তার পিতা এবং তখন তাঁর একান্ত আস্থাভাজন হতে তার অসুবিধা হবে না কোনো। দুর্গম স্থলপথে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে চলল সে এথেন্সের পথে। কখনও পাহাড়ের শীর্ষে উঠতে হচ্ছে তাকে, কখনও আবার উপত্যকার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। পাহাড়ের পথে একদিন এক অদ্ভুত-দর্শন মানুষের সঙ্গে দেখা হল তার। হরিণের চামড়ায় আচ্ছাদিত দীর্ঘকায় এক মানুষ। তার মাথায় বসানো হরিণের মুখটি বিচিত্র মুকুটের মত দেখাচ্ছে। পাহাড়ের অধীশ্বর হয়ে বসে আছে সে যেন; যাকেই সে পাহাড়ের ওপরে আসতে দেখে, তাকেই হত্যা করে সে। থিসিউস তাকে পথ ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষটি তাকে তার তরোয়াল আর সোনার পাদুকাদুটি দিয়ে দিতে বলল, তার কথা অমান্য করলে প্রাণনাশ করার হুমকি দিল। থিসিউস মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। তার প্রচণ্ড আক্রমণে ধরাশায়ী হল সেই বিকট-

দর্শন লোকটি। লোকটির গা থেকে হরিণের চামড়াটি খুলে নিয়ে থিসিউস নিজের শরীরে জড়িয়ে নিল।

আবার যাত্রা শুরু করে পাহাড়ের পথের প্রান্তে এক উপত্যকায় এসে পড়ল থিসিউস। সেখানে মুগ্ধ হয়ে দেখল, সুবিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে—সবুজের বুকে সাদার মেলা যেন। অদূরেই একদল রাখাল কয়েকজন বনপরীর সঙ্গে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে; কিন্তু একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা রয়েছে চারিদিকে, লক্ষ্য করল সে।

হরিণের ছাল গায়ে থিসিউসকে দেখে রাখালেরা ভয়ে আতঙ্কে বনের মধ্যে যে যেদিকে পারল পালাল।

থিসিউসের ক্ষিদে তেষ্টা পেয়েছিল খুব। কিন্তু কেই বা তাকে এখানে খাবার বা জল দেবে। দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত থিসিউস গা এলিয়ে ছিল এক গাছের তলায়—মুহূর্ত-মধ্যে গভীর ঘুম নেমে এল তার চোখে।

ঘণ্টাখানেক পর থিসিউস জেগে উঠে দেখে, রাখালেরা আর বনপরীরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল তাদের কথা। একজন রাখাল বলছে, 'গায়ে হরিণের ছাল দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি এই সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়ী মানুষটি। কিন্তু এখন দেখে বুঝতে পারছি, এ এক বলিষ্ঠ তরুণ, কি অপরূপ দেখতে একে।'

থিসিউস হেসে বলল তাদের, 'আমি থিসিউস, আমি ঐ ভয়ঙ্কর পাহাড়ী মানুষটিকে মেরে তার গা থেকে হরিণের ছাল খুলে নিজের গায়ে চড়িয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। তেষ্টা পেয়েছে খুব।'

একথা শুনেই বনপরীরা থিসিউসকে খাবার আর জল এনে দিল। রাখালেরা আর বনপরীরা আবার নাচ শুরু করে দিল—এবারে বাজনার তালে তালে। থিসিউসকে আহ্বান করল তারা, তাদের সঙ্গে নাচে যোগ দিতে। থিসিউসকে তারা থেকে যেতে বলল

তাদের সঙ্গে! কিন্তু থিসিউস তাদের বলল, তাকে এথেন্সে যেতে হবে, সেখানে ভীষণ জরুরী কাজ আছে তার। রাখাল আর বনপরীররা তাকে নিষেধ করল এথেন্সে যেতে। কেননা এথেন্সের পথে অনেক ডাকাত দস্যুর কবলে পড়তে হবে তাকে। তারা বলল তাকে, 'তোমার তরোয়াল আর সোনার পাদুকা দুটি কেড়ে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে তারা। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে ফুঁড়ে ওঠা যে পাহাড়টির উপর দিয়ে হাঁটতে হবে তোমাকে পরে, সেখানে একটা মানুষ-পিশাচ সবসময়েই ওৎ পেতে থাকে। যেই সেই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যায়, তাকেই সে তার পা ধুয়ে দিতে বলে। লোকে যখন ভয়ে মাথা নীচু করে তার পা ধুতে যায়, অমনি সে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে তাকে পাহাড়ের কোল থেকে সমুদ্রে ফেলে দেয় আর সমুদ্রের কোলে সেই জায়গায় এক বিশাল কুমীর হাঁ করে মুখ পেতে থাকে সেই পড়ন্ত লোকটাকে গিলে খেতে।

থিসিউস তা শুনে বলল, 'কোন পিশাচকে আমি ভয় পাই না। আমি যখন এদেশের রাজা হব তখন কোন পিশাচ ডাকাতের চিহ্ন থাকবে না এখানে। আমার দেশের লোকের ওপর অত্যাচার করলে ডাকাতেরা প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না।' রাখাল তার উত্তরে বলল, 'ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেলেও তুমি দুষ্ট রাজা সারসিয়নের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। সারসিয়নের মত বড় যোদ্ধা আর নেই। তার দুর্গে যেই আসে, তার হাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মেরে ফেলে তাকে।'

থিসিউস তার পিতার তরোয়ালটিকে মাথার উপর তুলে শপথ করল, 'এই পাহাড়ী এলাকায় যত ডাকাত দস্যু আছে, তাদের অত্যাচার থেকে এট্টিকার মানুষদের বাঁচাবার জন্য সকল দুষ্কৃতকারীদের আমি নিধন করব।'

রাখাল ও বনপরীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থিসিউস এথেন্সের পথে আবার চলা শুরু করল। রাখাল ও বনপরীরা থিসিউসের পথের বিপদের কথা ভেবে দুঃখিত মনে বিদায় জানাল থিসিউসকে।

সুদীর্ঘ পথ চলার মাঝে থিসিউস অনেকবার বিপদের মুখে পড়ল, কিন্তু প্রতিবারই ডাকাত বা দস্যুরা তাঁর হাতে প্রাণ খোওয়াল।

দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে চলতে চলতে অকস্মাৎ থিসিউস সারসিয়নের দুর্গে এসে পড়ল। যে লোকই থিসিউসকে সেখানে দেখল, সেই তাকে বলল ফিরে যেতে, তারা তাকে সাবধান করে দিল, সারসিয়নের হাতে তার মৃত্যু হবেই। কিন্তু থিসিউস তাদের কথায় কান না দিয়ে দুর্গের ভিতরে এক কক্ষে এসে হাজির হল। সেখানে দেখল সে, সারসিয়ন বিরাট একটি ভেড়ার ঝলসানো মাংস খাচ্ছে মহাতৃপ্তিতে।

থিসিউস সারসিয়নকে দেখেই চিৎকার করে বলল, 'এস, আমার সঙ্গে এক হাত লড়ে যাও।'

সারসিয়ন থিসিউসকে তার কক্ষের মধ্যে দেখে এবং তার নির্ভয় হঠকারি কথা শুনে হতবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার দিকে। অল্পক্ষণ পরেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বাসভরে বলল থিসিউসকে, 'এস, এস, আমার পাশে বস, খাও দাও তারপর তো লড়াই হবে।' থিসিউস সঙ্গে সঙ্গে সারসিয়নের পাশে আসন গ্রহণ করে ভেড়ার মাংস খেতে বসল।

খাওয়াদাওয়ার পর দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা হল। দুর্গের প্রাঙ্গণে সারসিয়ন থিসিউসকে নিয়ে গেল। সেখানে দেখল থিসিউস মানুষের ভাঙ্গা হাড়গোড় পড়ে আছে চারিদিকে। সারসিয়ন আর থিসিউস পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। দুর্গের দ্বার থেকে এই মল্লযুদ্ধ দেখতে লাগল বহু মানুষ রুদ্ধশ্বাসে। তারা নিশ্চিত ছিল নিজের এই দুঃসাহসিক হঠকারিতার জন্য থিসিউসকে প্রাণ হারাতে হবে সারসিয়নের হাতে। কিন্তু অভাবনীয় ব্যাপার! থিসিউস সমান তালে লড়তে লড়তে একবার সারসিয়নকে মাথার উপর তুলে নিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলল অবিশ্বাস্যভাবে।

তারপরেই থিসিউস সারসিয়নের দুর্গের দ্বার হাট করে খুলে দিল। দলে দলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্গের ভিতর ঢুকে থিসিউসের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। সেই রাজ্যের লোকেরা থিসিউসকে তাদের রাজার পদে বরণ করতে চাইল এবং তাদের মাঝে তাকে রেখে দিতে আগ্রহী হল। কিন্তু থিসিউস বলল তাদের, 'একদিন তোমাদের রাজা হব আমি; দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব আমি, দেশ সমৃদ্ধতর করব। কিন্তু এখন আমাকে এথেন্সে ফিরে যেতে হবে।'

আবার যাত্রা শুরু করল থিসিউস। এবারে কিছুটা পথ যেতেই থিসিউসের পা ধরে এল; বিরামহীন পথভ্রমণ এবারে কিছুটা কাবু করে দিল থিসিউসকে, শরীরের পেশীর যন্ত্রণার, ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লো থিসিউস। শ্রান্ত ক্লান্ত থিসিউস একটা আশ্রয়ের কথা ভাবল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন তার শরীরের। রাত নেমে আসায় তার মধ্যে বিশ্রামের ইচ্ছা প্রবলতর হল। সেই সময় আকস্মিক এক দীর্ঘকায় মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। পোশাকে চাল-চলনে তাকে একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক বলে মনে হল।

থিসিউস সামনে আসতেই লোকটি তাকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' থিসিউস উত্তর দিল, 'আমি এথেন্সে চলেছি।' লোকটি বলল, 'তোমাকে এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। এস আমার সঙ্গে পাহাড়ের উপরে আমার কুটীরে; পাহাড়ের ওপর এমন সাজানো গোছানো সুন্দর কুটীর এখানে আর দ্বিতীয়টি নেই। এস আমার সঙ্গে, রাতে আমার কাছেই খাবে দাবে, রাত্তিরটায় আমার ঘরেই শোবে। এমন সুন্দর আরামদায়ক বিছানা পাতা আছে আমার ঘরে শোয়ামাত্রই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে।'

লোকটি কথাগুলি বেশ মিষ্টিসুরে বলছিল কিন্তু তার চোখের মধ্যে একটা কাঠিন্যভাব এবং বক্রদৃষ্টি একটু নজর দিলেই লক্ষ্য করা যেত। থিসিউস অবশ্য লোকটিকে বিশ্বাসই করল। গভীর অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে তার মন চাইছিল

না। একে শরীর তার ক্লান্ত, অবসন্ন, সর্বাঙ্গ ব্যথাজর্জর তার ওপরে রয়েছে ঘোর অন্ধকারে পাহাড়ের দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি। তাই থিসিউস লোকটির সঙ্গে তার কুটীরে যাওয়াই মনস্থ করল।

পাহাড়ের ঢাল দিয়ে অন্য একটি রাস্তা দিয়ে লোকটি নিয়ে চলল থিসিউসকে তার কুটীরে। কিছুদূর যাওয়ার পর লোকটি থিসিউসকে দূর থেকে তার কুটীরটি দেখিয়ে বলল, 'আপনি ঐ কুটিরে যান, আমি এখনই আসছি, কিছু লোকের আসার কথা আছে আমার কুটীরে। তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে কাছাকাছি এসে পড়েছে, তাদের আমি পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছি।'

লোকটি চলে যেতেই থিসিউস অল্প কিছুটা পথ হেঁটেই কুটীরটি থেকে কয়েক হাত দূরে যখন এসে পড়ল তখন হঠাৎ দেখল পথের পাশে এক বৃদ্ধ রাস্তায় পড়ে থাকা কিছু কাঠের টুকরো একত্র করে গোছ করে বেঁধে কাঁধে তোলার চেষ্টা করছে। বৃদ্ধটি থিসিউসকে দেখেই তার সাহায্য চাইল। থিসিউস কাঠগুলো গোছ করে বেঁধে তুলে দিল বৃদ্ধটির কাঁধে। বৃদ্ধ তাকে বলল, 'এই রাতের অন্ধকারে কোথায় চলেছ?' থিসিউস উত্তর দিল, 'আমি থিসিউস, এথেন্স আমার গন্তব্যস্থল। সেখানে অনেক অন্যায় কাজ চলছে; তার প্রতিকার করতেই আমি চলেছি সেখানে। রাতের অন্ধকারে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল আমার। একটি লোক আমাকে তার কুটীরে রাতটা বিশ্রাম নিতে সুযোগ দিয়েছে। তার কুটীরেই যাচ্ছি। সামনেই সে কুটীর। আমাকে সে এখানে পৌঁছে দিয়েই এইমাত্র একটু এগিয়ে গেল তার কয়েকজন রাতের অতিথিকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসতে।'

বৃদ্ধ লোকটি চিৎকার করে উঠল 'আশ্চর্য বিছানাই বটে। তোমার সর্বস্ব নিয়েই ও ক্ষান্ত হবে না। ঐ বিছানায় তিলে তিলে ও তোমাকে মারবে। তুমি যদি অল্পক্ষণের জন্যও বিছানায় গা এলিয়ে দাও তোমার হাত-পা খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ও। ছোট বিছানার মাপ অনুযায়ী তোমার শরীরেরও মাপ ছোট হয়ে যাবে। ঐ যে লোকটি তোমায় নিয়ে এসেছে, ওর নাম প্রোকাসটাস। যার শরীরের মাপ

ওর বিছানা থেকে ছোট থাকবে তাকে সে এমনভাবে টেনে টেনে বড় করবে যে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হবে আর যার শরীরের মাপ ওর বিছানা থেকে বড় থাকবে তার হাত-পা কেটে তার শরীরটাকে বিছানার সমান মাপের করে দেবে, ফলে প্রাণবায়ু তার বেরিয়ে যাবেই। আমিও যদি এখান থেকে কখনও পালাবার চেষ্টা করি, তাহলে ও আমাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করবে।'

বৃদ্ধের এই কথা শুনে থিসিউস তখুনই সেই পথে ফিরে গিয়ে এথেন্সে যাওয়ার মূল পথে এসে পড়ল। রাস্তার মোড়ে এক জায়গায় দেখল প্রোকাসটাস কতকগুলি লোকের সঙ্গে কথা বলছে, তাদেরকে তার কুটীরে আসতে বলছে।

থিসিউস প্রোকাসটাসকে দেখে গর্জন করে বলল, 'তোমার মত নরপিশাচ আমি তো দেখি নি। তুমি তোমার কুটীরে লোকজনদের নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর উপায়ে খুন করছ অবলীলায়। আজ তোমার শেষ দিন।' কথা শেষ করতে না করতেই থিসিউস তার তরোয়াল তুলে ধরল। প্রোকাসটাসও কোমরে বাঁধা খাপ থেকে তার তরোয়ালটা বার করে থিসিউসের দিকে তাক করে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু তার আগেই নিজের জায়গা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে এগিয়ে এসে প্রোকাস্টাসের পা দুটো তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলল থিসিউস। তারপরেই তার হাত দুটোও কেটে ফেলল। প্রোকাসটাসের খণ্ডিত শরীরটাকে দুহাত দিয়ে মাথার উপর তুলে পাহাড় থেকে কয়েকশো গজ নীচে গভীর খাদে ছুঁড়ে ফেলে দিল থিসিউস।

তারপর থিসিউস প্রোকাস্টাসের কুটীরে গিয়ে অনেক ধনরত্নের সন্ধান পেল। সেগুলো সেই বৃদ্ধসহ স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। ঐসব লোকেরাও থিসিউসকে তাদের রাজার আসনে বসাতে চাইল। থিসিউস বলল তাদের, 'একদিন আমি তোমাদের রাজা হব। তবে এখন আমাকে যেতে হবে এথেন্সে জরুরী কাজে।'

এথেন্স অভিমুখে যতই থিসিউস এগোতে লাগল, দেখল সে, চলার পথে তাকে যেসব কাজ করতে হয়েছিল, বিভিন্ন অঞ্চলের

লোকেরা সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে এবং সুদীর্ঘ পথের দুধারে বসবাসকারী মানুষেরা সকলেই তাকে তাদের কাছে থেকে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা জানায়। কিন্তু থিসিউস তাদের সকলকেই একই কথা বলে, 'না, আজ না, আমাকে রাজা ইজিয়াসের প্রাসাদে যেতে হবে।'

বহুদিন ধরে বহু দুর্গম দুস্তর পথ অতিক্রম করে অবশেষে থিসিউস সুন্দর নগরী এথেন্সে এসে উপস্থিত হল। একটি ছোট পাহাড়ের উপর রাজা ইজিয়াসের প্রাসাদ ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। থিসিউস প্রাসাদের তোরণের সামনে গিয়ে দেখে সেখানে কোন প্রহরী নেই ; সোজা সে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে পড়ল। কোন প্রহরী বা সৈন্যকে রাজপ্রাসাদের পাহারায় দেখল না সে। মনে মনে বলল সে এটা একটা অত্যন্ত হতভাগ্য দেশ, রাজার নিরাপত্তার জন্য কোন সৈন্য বা প্রহরী কেউই নেই।

থিসিউস তার ঢিলেঢালা পোশাকের মধ্যে তরোয়াল এবং সোনার পাদুকা লুকিয়ে রেখে প্রাসাদের ভিতরে পা দিয়ে প্রশস্ত একটি কক্ষে ঢুকল। পিতার সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই তাঁর কাছে তার পরিচয় প্রকাশ করবে না ঠিক করল। সেই সুদৃশ্য কক্ষের এক প্রান্তে একটি লম্বা টেবিলের দুপাশে কয়েকজন যুবাপুরুষ বসে মহা ফূর্তিতে ভোজে বসেছে, তাদের দেখে মনে হল থিসিউসের, এদের মধ্যে সকলেই মন্ত্রী বা সেনাপতি। থিসিউস অবাক হয়ে গেল, মন্ত্রী ও সেনাপতিরা যাদের উপর শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রয়েছে, রাজপ্রাসাদে বসে মহাফূর্তিতে মশগুল রয়েছে তারা—সময়ের কোন দামই নেই তাদের কাছে।

সেই যুবাপুরুষেরা থিসিউসকে দেখেই বলল, 'কি ব্যাপার ছোকরা, কি চাও তুমি?

'আমি আপনাদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আচ্ছা, রাজ্যশাসনের ভার কি তাঁর ওপর নেই? অন্তত প্রাসাদের হালচাল দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

থিসিউসের এই কথা শুনে লোকগুলো আত্মপ্রসাদের সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল—'আমরাই এ রাজ্যের শাসনকর্তা। কি চাই তোমার?'

'রাজাকে বলুন, থিসিউস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে'।

ভিতরে একটি কক্ষে রাজা ইজিয়াস যেখানে ডাইনী মিডিয়ার সঙ্গে বসেছিলেন, সেখানে একজন ভৃত্য খবর দিতে গেল।

রাজা ইজিয়াস ভৃত্যের কথা শুনে সশব্যস্তে থিসিউসের সঙ্গে দেখা করতে উঠে পড়লেন। মিডিয়া তাঁকে বাধা দিল, 'অপেক্ষা কর, কে এই থিসিউস?' রাজা বললেন, 'থিসিউস এক মহান বীরপুরুষ। আমার দেশের ডাকাত দস্যুদের সেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আমি অবশ্যই তার কাছে যাব, এবং তাকে স্বাগত জানাব।

রাজা ইজিয়াসের পেছনে মিডিয়াও থিসিউসের কাছে গেলেন।

থিসিউস পিতাকে দেখে এমনই আনন্দিত হল যে ইচ্ছা হল তার পিতার কাছে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। কিন্তু থিসিউস ভাবল মনে, 'আমার পিতা আমাকে পছন্দ নাও করতে পারেন, আমি অপেক্ষা করব এবং দেখব তিনি কি করেন।'

থিসিউসের সুগঠিত চেহারা ও বীরত্বব্যঞ্জক আচরণ রাজা ইজিয়াসকে মুগ্ধ করে দিল। তিনি যদি জানতেন এই তার ছেলে তাহলে কি আনন্দ উচ্ছ্বাসেই না হত তার। রাজা বললেন, 'তোমাকে স্বাগত জানাই থিসিউস। তুমি আমার রাজ্যের এতবড় উপকার করেছ যে আমি তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। যা কিছু আমার আছে, আজ থেকে সবেরই মালিক তুমি।'

সেই যুবাপুরুষেরা এই কথা শুনে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখলে, ইজিয়াস থিসিউসকে কি রকম ভালবেসে ফেলেছে। থিসিউসকে শুধু এথেন্সে কেন, গোটা এ্যাটিকায় কোথাও থাকতে দেব না আমরা, ওকে আমরা রাজ্যছাড়া করবই। থিসিউস কিছুতেই রাজার উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। আমাদের মধ্যে একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে।'

রাজা থিসিউসকে খাবার টেবিলে বসতে বললেন। ভৃত্যেরা তার জন্যে খাবার নিয়ে এল। রাজা ইজিয়াস থিসিউসের সামনে বসলেন তার সঙ্গে গল্প করার জন্য। মিডিয়া পাশে দাঁড়িয়ে রইল। খেতে খেতে থিসিউস তার কাহিনী ইজিয়াসকে শোনাল, সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তার যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার কথা বলল।

এদিকে ডাইনী মিডিয়া মনে মনে ভাবতে লাগল, 'ইজিয়াস থিসিউসকে তাঁর সিংহাসনে একদিন বসাবেই। আমি যেমন ইজিয়াসকে বশীভূত করেছি, থিসিউসকেও সেরকমভাবে বশীভূত করতে হবে আমাকে।' মিডিয়া হঠাৎ সেই ঘর ছেড়ে ভিতরে অন্য একটি ঘরে চলে গেল। একটু পরে একটি সোনার পাত্রে রঙিন পানীয় এনে থিসিউসের মুখের কছে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই সুমিষ্ট সুস্বাদু পানীয় বিভিন্ন রসের ফলে তৈরি। এই পানীয় আমি রাজা ছাড়া কাউকে দিই না। কিন্তু তুমি যে শৌর্ববীর্যের পরিচয় দিয়েছে তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে এই পানীয় আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিলাম।'

থিসিউস মিডিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লক্ষ্য করল সে, মিডিয়ার মুখটি বেশ সুন্দর; কিন্তু তার চোখের মধ্যে একটা কুটিলভাব স্পষ্ট হয়ে আছে। এই দুষ্ট ডাইনীর কথাই মা তাকে বলেছিল, মনে পড়ল তার।

থিসিউস বলল মিডিয়াকে, এই পানীয় নিশ্চিতই খুবই উপাদেয় হবে, এর প্রাণমাতানো গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। কিন্তু আমি এত সুন্দর পানীয়ের সবটাই একা খাব না, তোমার সঙ্গে ভাগ করে খাব। প্রথমেই তুমি ঐ পাত্রে চুমুক দাও, তারপরে আমি চুমুক দেব।'

'না, না, আমি এই পানীয় খেতে পারব না। কোনরকম পানীয় আমার সহ্য হয় না। খেলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

থিসিউস মিডিয়ার কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে মিডিয়ার মুখে ধরে

আদেশের সুরে বলল, 'তোমাকে এই পানীয় খেতেই হবে, অন্যথায় বিপদ হবে তোমার,।'

ইতিমধ্যে টেবিল থেকে সকলে উঠে এসে থিসিউসকে ঘিরে ধরল। রাজা ইজিয়াস চিৎকার করে বললেন, 'থিসিউস তুমি করছ কি ?'

মিডিয়া তখন প্রচণ্ড আর্তনাদ করে থিসিউসের হাতে ধাক্কা দিয়ে সোনার পাত্রটিকে মাটিতে ফেলে দিল। থিসিউস সঙ্গে সঙ্গে তার তরোয়াল নিয়ে মিডিয়াকে আঘাত করতে গেল। তার আগেই ডাইনী মিডিয়া প্রাসাদ ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা ইজিয়াস উত্তেজিত হয়ে গেলেন—'থিসিউস, কি করলে তুমি !'

থিসিউকে রাজাকে বলল তখন, 'দেখুন, পানীয়ের পাত্রটা মাটিতে পড়ে মেঝের কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। মেঝেতে যেখানে ঐ পানীয় গড়িয়ে পড়েছে, মেঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। এমন কিছু একটা ক্ষয়কারক জিনিষ পানীয়ের মধ্যে মেশানো ছিল যা মেঝের এই অবস্থান্তরের কারণ। ডাইনী মিডিয়া বশীকরণ ওষুধ খাইয়ে আপনাকে যেমন বশ করে ফেলেছে আমাকেও তাই করতে এসেছিল। এই সুন্দর নগরী এথেন্স আজ ডাইনী মিডিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেল, রাহুমুক্ত হল এথেন্স এতদিনে। আমি আপনার তরবারি আর সোনার পাদুকা নিয়ে এসেছি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করতে, এই রাজ্যে যত অন্যায় পাপ ছেয়ে গেছে তা সমূলে নির্মূল করতে।'

ইজিয়াস তার তরোয়াল আর সোনার পাদুকা থিসিউসের কাছে দেখে চিনতে পারল তাকে সঙ্গে সঙ্গে, থিসিউস যে তারই ছেলে। অন্তরের আবেগে বললেন, 'পুত্র আমার কি আনন্দ আজ! আমার বিপদের দিনে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ। আজ আমার শক্তি হাজারগুণ বেড়ে গিয়েছে।'

তারপর রাজা টেবিলের পাশে বসা তরুণ রাজকর্মচারীদের দিকে ফিরে বললেন, 'এই আমার ছেলে, আমার কাছে ফিরে এসেছে বহুদিন পরে। সে এখন বেশ শক্তিমান ও যোগ্য মানুষ।'

এই কথায় উত্তেজিত হয়ে রাজ-অমাত্যরা তাদের খাপ থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে রাজার কাছে এসে বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন যে থিসিউস আপনার ছেলে? আমাদের কাছে সে অবাঞ্ছিত। তাকে আমরা এ রাজ্য থেকে দূর করে দেব।' সেই রাজ অমাত্যরা আশা করেছিলেন তাঁদেরই একজন রাজ সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু কোথা থেকে এই ছেলেটি এসে বাদ সাধল।

থিসিউস রাজ অমাত্যদের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য বলল, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে চিরদিনের মত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলি। কিন্তু সেই অমাত্যরা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে শত্রু হিসেবে ভেবে সকলে একসঙ্গে অস্ত্র নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

থিসিউস তার তরোয়াল নিয়ে একাই তাদের সঙ্গে তুমুল বিক্রমে যুঝে তাদের সকলকে পরাভূত করল। কয়েকজন নিহত হল তার হাতে, আর যে কজন বেঁচে থাকল, চিরদিনের মত রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল তারা।

পুত্র থিসিউসের সাহায্যে রাজা ইজিয়াস দেশে আবার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। দেশে সকলরকম অপরাধ নিবারিত হয়। এত-দিনে দেশের মানুষ নিরুপদ্রবে জীবন কাটাতে সমর্থ হল। দেশে গাঁয়ে রাখালেরা তাদের গরু ভেড়া নিয়ে আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তুলল মাঠে প্রান্তরে। কোন ডাকাত আর দস্যু দেশে নেই যে তাদের গরু ভেড়া চুরি করে নিয়ে যাবে। খেতে খেতে চাষীরা ফলাতে লাগল শষ্য নিরুপদ্রবে। চাষীদের কাছ থেকে এই শষ্য কিনে ব্যাপারীরা তা বিভিন্ন পথে বিক্রি করতে আসে এথেন্সের বাজারে নির্বাধায়, নিরুপদ্রবে। এ্যাটিকা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে, এথেন্সে যাওয়ার প্রতিটি পথে আর কোন ডাকাত দস্যুর উপদ্রব থাকল না। নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে দেশের মধ্যে দূর দূর পথে লোকেরা চলাফেরায় নিরাপত্তা ফিরে পেল।

ক্রমে বছর ঘুরে এল। সেই সময় রাস্তায় একদিন থিসিউস

একাই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। এথেন্সের পথে যার দিকে সেদিন তার চোখ পড়ল, তাকেই যেন কেমন বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল তার। কিন্তু যাকেই থিসিউস জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে তাদের সকলের, সেই কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, প্রত্যেকের চোখের কোণেই জল দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল থিসিউস।

প্রাসাদে ফিরে এসেই হন্তদন্ত হয়ে পিতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, কি হয়েছে আজ এথেন্সবাসীদের? তাদের সকলের চোখ ছলছল করছে কেন আজ?

রাজা ইজিয়াস সে প্রশ্ন শুনে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, পাছে তার পুত্র দেখে ফেলে যে রাজার চোখেও জল। সেই অবস্থাতেই বললেন তিনি, 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। সময় হলেই তুমি সেই দুঃখজনক ঘটনার কথা জানতে পারবে।' আর একটা কথাও বললেন না তিনি।

কয়েকদিন পর কালো পালতোলা একটি জাহাজ এথেন্সের দরিয়ায় এসে ভীড়ল। কালো পোশাক পরা একটি লোক জাহাজ থেকে নেমে এথেন্সের রাস্তা ধরে পাহাড়ের উপর ইজিয়াসের প্রাসাদে এসে উঠল।

রাজপ্রাসাদ থেকে থিসিউস দেশবাসীর কান্নার রোল শুনতে পেল। পিতার কাছে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে থিসিউস জিজ্ঞেস করল, 'আজ আমায় তোমাকে বলতে হবে কেন এথেন্সের মানুষ কাঁদছে?'

'কালো পোশাক পরা একটি লোক প্রাসাদে আসছে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে সব।' এক নিঃশ্বাসে বললেন ইজিয়াস!

প্রাসাদের মধ্যে সেই লোকটি আসতেই তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল থিসিউস, 'আপনি কিজন্য এখানে এসেছেন? এথেন্সের লোকেরা আজ কাঁদছে কেন? আপনি নাকি সব জানেন।'

'প্রতি বছর এথেন্সের রাজা ইজিয়াস ক্রিটের রাজা মাইনোসের কাছে সাতটি তরুণ ও সাতটি তরুণীকে একই সঙ্গে পাঠায়।' গম্ভীর স্বরে বলল লোকটি।

'কিন্তু কেন? রাজা ইজিয়াস কেন তাদের পাঠায় ক্রিটের রাজার কাছে? বলুন আমায়, আমি রাজা ইজিয়াসের পুত্র থিসিউস।'

'তুমি রাজা ইজিয়াসের পুত্র। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জানাতেই হবে। শোন তবে, রাজা মাইনোসের এক ছেলে ছিল। একবার সে এথেন্সে এসেছিল আমোদফুর্তি করতে। নকল মল্লযুদ্ধেও কয়েকবার যোগ দিয়েছিল। এথেন্সেই তাকে প্রাণ হারাতে হয়। কে বা কারা অজ্ঞাত কারণে খুন করে তাকে। রাজা মাইনোস সে খবর পেয়ে বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে সমুদ্রপথে জাহাজে পাড়ি দিয়ে এথেন্সে উপস্থিত হন। এথেন্স নগরীকে ধ্বংস করে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিতে আদেশ দিলেন তিনি তার সৈন্যসামন্তদের। এথেন্সের রাজা ইজিয়াসের ক্ষমতা ছিল না মাইনোসকে বাধা দেয়। ইজিয়াস মাইনোসকে এই ভয়ঙ্কর কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন যে কোন শর্তে। মাইনোস তখন ইজিয়াসকে বললেন, একটিমাত্র শর্তে তিনি ধ্বংসকাজ বন্ধ রাখতে পারেন, যদি প্রতি বছর ইজিয়াস তাঁর রাজ্য থেকে সাতটি তরুণ ও সাতটি তরুণীকে ক্রিটে পাঠান মাইনোসের নিজের পোষা জন্তু মিনোটরের খাদ্য হিসাবে।'

থিসিউস উত্তেজনায় কেঁপে উঠল সব শুনে। পিতার কাছে ছুটে এসে জানতে চাইল সে যা শুনল, সব কি সত্যি। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল। ইজিয়াস তাকে বললেন, 'মাইনোসের ছেলেকে খুন করার জন্য এথেন্সবাসীদের এইভাবেই তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।'

থিসিউস পিতাকে তখন দৃপ্তভাবে বলল, 'এবারে যে সাতজন তরুণ যাবে তাদের মধ্যে আমিও একজন থাকব।'

একথা শুনে ইজিয়াসের বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল। তিনি পুত্রকে বললেন, 'থিসিউস, তুমি যেও না। তোমাকে হারাতে পারব না! তোমাকে আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি বৃদ্ধ অশক্ত হলে বা আমার মৃত্যু হলে তোমাকেই এথেন্সের রাজ্যভার মাথায় নিতে হবে। এথেন্সের পরবর্তী রাজাকে আমি মিনোটরের মুখে ঠেলে দিতে পারব

না, অর্ধেক ষাঁড়, অর্ধেক মানুষ সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটার শিকার হতে দিতে পারি না তোমাকে, কিছুতেই না।'

থিসিউস পিতাকে অভয় দিয়ে বলল, 'আমি এবং অন্য তেরজন তরুণ-তরুণী যারা এবারে মিনোটরের মুখের কাছে যাব, আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমাদের প্রত্যেকেই অক্ষত দেহে ফিরে আসব। আমি সেই ভয়ঙ্কর জন্তু মিনোটরকে বধ করবই।'

'কিন্তু কিভাবে তুমি সেই মিনোটরকে বধ করবে? ক্রিটে তোমাকে তরোয়াল নিয়ে প্রবেশ করতে দেবে না।'

'আমার হাত-পা আছে, আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। এর জোরেই মিনোটরকে মারব।'

তখন ইজিয়াস বললেন, 'তোমাকে আমি বাধা দিতে পারব না; কিন্তু একটা কাজ করতে হবে তোমাকে আমার জন্য। একটি কালো পালতোলা জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ক্রিটে নিয়ে যাবে তোমাদের। যখন তুমি মিনোটরকে মেরে তোমার লোকজনদের নিয়ে ফিরে আসবে সমুদ্রপথে তখন জাহাজটির ঐ কালো পাল নামিয়ে দিয়ে সাদা পাল খাটাবে জাহাজে। ঐ সাদা পালতোলা জাহাজটি দেখে আমি বুঝতে পারব, তুমি এবং তোমার সাথীরা অক্ষত দেহে ফিরে এসেছ। চোদ্দজন তরুণ-তরুণীদেরর তালিকার মধ্যে তোমার নামও দিয়ে দিচ্ছি রাজা মাইনোসের প্রতিনিধির কাছে।'

থিসিউস নির্দিষ্ট দিনে পিতাকে বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের তীরে চলে গেল যেখানে কালো পালতোলা জাহাজটি দাঁড়িয়েছিল সাক্ষাৎ যমদূতের মত। সাতজন তরুণীকে জাহাজে তোলা হয়েছিল, ছ'জন তরুণ নীচে দাঁড়িয়েছিল, থিসিউসকে নিয়ে হল তারা সাতজন, তাদেরও এবার জাহাজে তুলে দেওয়া হল।

জনতার কান্নার রোল থিসিউসের জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শত-গুণ বেড়ে গেল। তাদের কান্নার রোলের মধ্যে জাহাজ ক্রিটের উদ্দেশে রওনা হল। অদম্য তেজ ও পৌরুষকার নিয়ে থিসিউস অভয় আশ্বাস দিতে লাগল সেই জনতাকে আর তার সাথীদের বিশেষ করে যারা

চলেছে জাহাজে ক্রিটের উদ্দেশে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে। তীরে দাঁড়ানো দেশবাসীদের উদ্দেশে থিসিউস নিরুদ্বিগ্নভাবে হাত নাড়তে লাগল। জাহাজ ধীরে ধীরে তীরে দাঁড়ানো এথেন্সবাসীদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

ক্রিটে জাহাজটি এসে পৌঁছলে ঐ চোদ্দজন এথেন্সবাসীকে ক্রিটের সৈন্যরা রাজা মাইনোসের কাছে নিয়ে এসে হাজির করল। রাজার সামনে একসারিতে তাদের দাঁড় করানো হল। হঠাৎ থিসিউস কয়েক পা এগিয়ে রাজার একেবারে সামনে এসে বলল, 'আমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছি এবং আমার প্রার্থনা, আমাকে যেন মিনোটরের কাছে প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয়।'

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পরিচয় কি ?'

'আমি থিসিউস, রাজা ইজিয়াসের ছেলে। আমি এখানে এসেছি দীর্ঘদিনের একটি অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে।'

ক্রিটের রাজা মাইনোস থিসিউসকে এক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে মনে মনে ভাবলেন, রাজা ইজিয়াসের ছেলে থিসিউস তার দেশের লোকদের একটা ঘোরতর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজেই প্রাণ-বিসর্জন দিতে এসেছে। রাজার ছেলে বলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। থিসিউসকে বললেন তিনি, 'তুমি তোমার দেশে পিতার কাছে ফিরে যেতে পার। তোমার মত রাজপুত্রের এভাবে মৃত্যুবরণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।'

থিসিউস মুখের ওপর রাজাকে বললেন, 'না। আমার সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর জন্তু মিনোটরের মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি পিতার কাছে ফিরে যাব না।'

তখন রাজার নির্দেশে সৈন্যরা ঐ চোদ্দজন তরুণ-তরুণীকে কারাগারে নিয়ে গিয়ে বদ্ধ করে রাখল।

সমস্ত ব্যাপারটা আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল রাজা মাইনোসের কন্যা এ্যারিয়াদ্‌ন্। সুন্দর কান্তি থিসিউসের দুঃসাহস দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিল এ্যারিয়াদ্‌ন্। থিসিউসের প্রতি ভালবাসা উদ্বেল হয়ে

উঠল তার। থিসিউসের প্রাণের দাম তার কাছে অসীম মনে হল। তার মৃত্যু রোধ করতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রয়াসী হল সে।

নিশুতি রাতে এ্যারিয়াদ্‌ন্ বন্দীশালায় গিয়ে প্রহরীদের সুগন্ধী সুস্বাদু পানীয় খেতে দিলেন। রাজকন্যার হাত থেকে পানীয় পেয়ে তারা তো অভিভূত হয়ে গেল। সেই পানীয়ের মধ্যে মেশানো ছিল এমন ওষধিলতার রস যা খেলে ক্ষণিকের মধ্যেই মানুষ অচৈতন্য হয়ে যায়। ঐ পাণীয় অঢেল পান করে বন্দীশালার প্রহরীরা একে একে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। থিসিউস যে কারাকক্ষে বন্দী ছিল সেই কারাকক্ষের চাবি খুলে নিল এ্যারিয়াদ্‌ন্, অচেতন এক প্রহরীর কোমর থেকে। কারাকক্ষটির দরজা খুলে এ্যারিয়াদ্‌ন্ ফিসফিস করে ডাকল থিসিউসকে। থিসিউস ঘোর বিস্ময়ে দরজার দিকে তাকাল, দেখল এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে কারাকক্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যারিয়াদ্‌ন্ তাকে ডেকে চাপা গলায় বলল, 'আমি এ্যারিয়াদ্‌ন্। রাজা মাইনোসের কন্যা। ঘুম-পাড়ানি ওষুধ-মেশানো পানীয় দিয়ে প্রহরীদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। কারাগার থেকে বাইরে যাওয়ার পথ এখন খোলা রয়েছে। তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদের আমি বাঁচাতে চাই। মরতে আমি দেব না তোমাদের। তোমরা এক্ষুণি বন্দীশালা থেকে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রের তীরে নোঙ্গর-করা কালো পালতোলা জাহাজটিতে উঠে পড়। সমুদ্রপথে পালিয়ে যাও তোমরা তোমাদের দেশে। আমাকে সঙ্গে নেবে তো! আমার এই কাজের জন্য আমাকে ক্ষমা করবে না আমার পিতা, আমার মৃত্যুদণ্ড হবেই। আমি রক্ষা পাব, যদি তোমরা আমাকে নিয়ে যাও তোমাদের সঙ্গে।'

থিসিউস সুস্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দিল যে তারা কিছুতেই এ দেশ ছেড়ে পালাবে না, মিনোটরকে না মেরে সে এদেশ ছাড়বে না।

তখন এ্যারিয়াদন বলল থিসিউসকে, 'তোমাকে আমি দুটো জিনিস দেব।' এ্যারিয়াদন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল সে কি করবে যদি থিসিউস পালাতে রাজী না হয়। এ্যারিয়াদন তার পোশাকের

ভিতরে লুকোনো একটি ছোট তরোয়াল এবং সূক্ষ্ম ছিলার একটি গোলা বার করে তাকে দিয়ে বলল, 'মিনোটর থাকে এক গোলকধাঁধায়। সেই গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসা যায় না। তুমি যদি মিনোটরকে গোলকধাঁধার মধ্যে মেরেও ফেল, তাহলেও তোমার রক্ষা নেই। সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার সবরকম চেষ্টা তোমার ব্যর্থ হবেই এবং পচে মরতে হবে তোমাকে সেখানে। তাই তোমাকে এই সরু ছিলার বল দিলাম। তুমি গোলকধাঁধার মুখে ছিলার একটি মুখ আমার হাতে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়বে। যত ঘুরপাক খেতে হোক না তোমাকে, ফিরে আসতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না, কেননা তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গে ছিলার দড়ি খুলতে খুলতে মাটিতে গড়িয়ে চলবে। মাটিতে পাতা বরাবর ছিলার নিশানা দেখে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তরোয়াল ছাড়া মিনোটরকে বধ করবে কি করে? তাই এই তরোয়ালটিকে সঙ্গে দিলাম তোমার।'

তারপর এ্যারিয়াদন থিসিউসকে মিনোটরের গোলকধাঁধার কাছে নিয়ে গেল। এ্যারিয়াদন ছিলার একটি মুখ নিজের হাত রেখে ছিলার বলটি থিসিউসের হাতে ফিরিয়ে দিল। বাঁ হাতে ছিলার বলটি আর ডান হাতে তরোয়াল নিয়ে ঢুকে পড়ল থিসিউস সেই অন্ধকারপুরীতে। নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু, ঘুরপাক-খাওয়া পথে হাঁটতে হাঁটতে থিসিউসের মাথা ঘোরার উপক্রম হল। এমন সময় গোলকধাঁধার এক প্রান্তে বিকট গর্জন শোনা গেল। গোলকধাঁধায় তখন ভোরের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে থিসিউস দেখল এক ভয়ানক আকৃতির বিশালকায় জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরটা অস্বাভাবিক উচ্চতাবিশিষ্ট—ধড়টি তার মানুষের মত কিন্তু তার মাথাটা বিকটাকার ষাঁড়ের, সিংহের মত গজাল দাঁত তার।

থিসিউসকে দেখামাত্র মিনোটর লক্ষ্যস্থির করে শিং উঁচিয়ে বীভৎসভাবে হাঁ করে তার দিকে ছুটে এল। থিসিউস একপাশে সরে গিয়ে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল এবং পেছন থেকে তার পায়ে

তরোয়ালের কোপ দিল। এইভাবে যতবারই ক্ষিপ্ত হয়ে মিনোটর থিসিউসকে হাঁ করে খেতে আসছিল ততবারই থিসিউস পাশ কাটিয়ে তার ছুপায়ে তরোয়ালের আঘাত হানতে লাগল। শেষে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে মিনোটর মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, তখন থিসিউস তার তরোয়ালটিকে মিনোটরের বুকের মধ্যে সজোরে গেঁথে দিল।

এরপর থিসিউস ছিলার বলটা গুটোতে গুটোতে ছিলার নির্দিষ্ট নিশানা বরাবর গোলকধাঁধার বাইরে বেরিয়ে এল। এ্যারিয়াদনকে ঠায় দাঁড়ানো দেখল গুহার সামনে ছিলার এক প্রান্ত হাতে ধরে। ছুজনে এবার সোজা চলে গেল বন্দীশালায়। তখনও প্রহরীরা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সেই তেরজন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে থিসিউস ও এ্যারিয়াদন সোজা সমুদ্র-তীরে এসে নোঙ্গর করা কালো পালতোলা জাহাজে উঠে পড়ল। কোন লোক জাগার আগেই কাকভোরে তারা জাহাজে পাড়ি দিল এথেন্সের উদ্দেশে।

সমুদ্রপথে দিন গড়িয়ে রাত নেমে এল। গভীর রাত। সকলেই নিদ্রামগ্ন। দেবী মিনার্ভা জাহাজে এসে থিসিউসকে জাগিয়ে বলল, 'তুমি এ্যারিয়াদনকে এথেন্সে নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি এই সামনের দ্বীপটায় এ্যারিয়াদন-কে রেখে যাবে। আমি তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেব।'

এ্যারিয়াদনকে ছেড়ে যেতে হবে বলে থিসিউসের নিদারুণ মনোকষ্ট হল, কিন্তু দেবী মিনার্ভার নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই থিসিউস ঘুমন্ত এ্যারিয়াদনকে নামিয়ে দিল সেই দ্বীপে। কালো পালতোলা জাহাজটি এই চোদ্দজন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে ভেসে চলল দ্রুত এথেন্সের দিকে— এ্যারিয়াদন পড়ে থাকল সেই দ্বীপে ঘুমন্ত অবস্থায়। থিসিউস ও তার সাথীরা তাদের মুক্তিদাতৃ এ্যারিয়াদন-এর কথা ভুলতে পারল না কিছুতেই। সমস্ত সমুদ্র-পথটায় কেবল তার কথাই ঘুরেফিরে আসে তাদের মনে। থিসিউস মনে মনে কেবলই ছুঃখ করে, দেশে ফেরার আনন্দ পরিপূর্ণ হত যদি আজ এই দিনে এ্যারিয়াদন্

সঙ্গে থাকত। এ্যারিয়াদ্‌ন্‌-এর চিন্তাতেই থিসিউস সারাটা সমুদ্র-পথ এমনই বিভোর হয়ে থাকল যে কালো পাল নামিয়ে সাদা পাল খাটানোর কথা বেমালুম ভুলে গেল সে।

রাজা ইজিয়াস সমুদ্রতীরে একটা পাহাড়ের উপর উঠে বসে সমুদ্রের উপর জাহাজের দিকে নজর রাখছিলেন অতন্দ্র চোখে, হঠাৎ দূরে একটি জাহাজকে দেখলেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে এথেন্সের উপকূলের দিকে। জাহাজটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল; সমুদ্রতীর থেকে জাহাজের দূরত্ব কমতে কমতে জাহাজের আকার উত্তরোত্তর বড় হয়ে এল তাঁর দৃষ্টিপথে। এবার রাজা ইজিয়াস সমুদ্রের কিনারায় পাহাড়ের উপর আরও একটি উঁচু ধাপে উঠে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে একটি কালো পালতোলা জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরে নিলেন থিসিউস আর তার সাথীরা মিনোটরের পেটে গিয়েছে। তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। তাঁর একমাত্র উপযুক্ত সন্তান, এ্যাট্টিকার রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রাণপ্রিয় থিসিউস আর বেঁচে নেহ—এই ধারণার বশে শোকাপ্লুত হয়ে রাজা ইজিয়াস পাহাড়ের ঐ উঁচু ধাপ থেকে সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপ দিয়ে জীবন-বিসর্জন দিলেন। অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউ তার দেহটাকে ত্বরন্ত গতিতে ঠেলে তুলে দিল তটে। তাঁর নামেই এই সমুদ্রের নাম 'ইজিয়ান সাগর'।

তার নিজের ভুলের জন্যই পিতা আত্মঘাতী হলেন—গভীর মর্মবেদনা হল থিসিউসের। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণপ্রিয় এ্যারিয়াদনকে পরিত্যাগ করে এসে তো তার মনস্তাপের সীমা ছিল না, তার ওপর আবার নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য পিতার প্রাণ-বিসর্জনে থিসিউসের বুক যেন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

যাই হোক এথেন্সবাসীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে থিসিউন এ্যাট্টিকার রাজ-সিংহাসনে বসলেন এবং দীর্ঘকাল অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দেশসাসন করেন তিনি। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন তাঁর ব্রত ছিল। শান্তিশৃঙ্খলা সুখসমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে।

পারসিউসের কাহিনী

বহুকাল আগে সেরিফোস দ্বীপে এক ধীবর বাস করত—তার সহৃদয় ব্যবহার ও পরোপকারিতার জন্ম সকলে ভালবাসত তাকে। দিকতিস নাম তার।

একদিন দিকতিস আর তার সঙ্গীরা সমুদ্রের কিছুটা ভিতরে নৌকো থেকে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। হঠাৎ একটি বড় মাপের কাঠের বাক্সকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখল তারা। ঐ জেলেদের একটা নৌকো এগিয়ে গিয়ে বাক্সটিকে তুলে নিল নৌকোর পাটাতনে। তারপর সকলে মিলে এসে বাক্সটিকে নামিয়ে তার ঢাকনা খুলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। একটি সুন্দরী মহিলা ও একটি ছোট ছেলে রয়েছে বাক্সটির মধ্যে। দুজনকেই তারা মাটিতে নামাল।

দিকতিস এবং তার সাথীরা প্রথমে ভেবেছিল, এই দুজনেই বুঝি মৃত। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে মহিলাটি তার চোখ খুলল। দিকতিসের দয়ার্দ্র মুখটা সামনে দেখেই বলল তাকে, 'অনুগ্রহ করে আমার ছেলেটিকে বাঁচান। দেবরাজ জুপিটার এর পিতা, আমি এর মা, পৃথিবীরই এক কন্যা আমি। আমার পিতা একে হত্যা করতে

চেয়েছিল। এই মর্মে এক দৈববাণী শুনেছিল আমার পিতা যে জুপিটার এবং ড্যানের পুত্র পারসিউস আমার পিতাকে হত্যা করবে। আমার পিতা কুখ্যাত রাজা হিসাবে পরিচিত ছিলেন।'

দিকতিস ড্যানে এবং তার ছোট ছেলে পারসিউসকে তার স্ত্রীর কাছে বাড়ীতে নিয়ে এল। দিকতিস নিঃসন্তান ছিল তাই পারসিউসকে তারা নিজের সন্তানের মতোই মানুষ করতে লাগল। পারসিউস ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। এখন সে দীর্ঘকায় এক স্বাস্থোজ্জ্বল যুবাপুরুষ।

এই ধীবর দিকতিসের একটি বড় পরিচয় ছিল। সে সেরিফোস দ্বীপের রাজার ভাই। সেরিফোসের রাজা একদিন সমুদ্রতীরে তাঁর ভাইয়ের কুটীরে এসে অপরূপ সুন্দরী ড্যানিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ড্যানে একমাত্র দেবরাজ জুপিটারকেই ভালবাসতেন। দিকতিসের ভাই রাজা পলিদেকতেসকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে দিল এবং তার এই প্রস্তাবের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করল।

রাজা পলিদেকতিস খুবই দুষ্ট এবং নীচ প্রকৃতির ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝলেন যতদিন পারসিউস মার কাছে থাকবে, ড্যানিকে কিছুতেই তার প্রাসাদে আনা যাবে না। পারসিউসকে হত্যা করার জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা ভাঁজলেন।

পলিদেকতিস কয়েকদিন পর প্রাসাদে একটি ভোজ-উৎসবের আয়োজন করলেন। রাজা তাঁর ভাই দিকতিস আর তার স্ত্রীর সঙ্গে পারসিউস এবং তার মাকেও আমন্ত্রণ জানালেন। অভ্যাগত অতিথিরা প্রত্যেকেই রাজার জন্য কিছু না কিছু উপহার আনলেন। কিন্তু ড্যানে আর পারসিউস কোন উপহার নিয়ে যেতে পারে নি, কেননা তাদের খুবই অসহায় অবস্থা, দিকতিসের দয়ায় তারা বেঁচে আছে।

প্রত্যেকের উপহার একে একে নিয়ে রাজা শেষে পারসিউসকে বললেন, 'তোমরা রাজার জন্য কি উপহার নিয়ে এসেছ?' পারসিউস

উত্তরে কোন কথা বলল না। রাজা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পারসিউসকে বললেন, 'আমি কি তোমাদের রাজা নই? তুমি আমার দেশে মানুষ হয়েছ, আমার ভাই তোমাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে। তুমি কে এমন বড় দরের মানুষ যে রাজাকে তুমি উপহার দেওয়ার কোন গরজই বোধ করছ না?'

পারসিউসকে উত্তেজিত করতে সফল হল পলিদেকতিস এই কথা বলে। পারসিউস ঘাড় উঁচু করে সোজা হয়ে দৃপ্তস্বরে বলল, 'আমি পারসিউস, দেবকুলের রাজা জুপিটারের ছেলে। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহলে যত উপহার আপনি এখানে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক ভাল উপহার নিয়ে আসতে পারি আপনার জন্য।

তার এই কথা শুনে রাজা ও তাঁর পারিষদেরা অবজ্ঞার ছলে হো করে হেসে উঠলেন। রাজা তার ইয়ার বন্ধুদের বললেন, 'পারসিউস যেন গরগনের মাথা এনে আমাকে উপহার দিতে পারে।'

তা শুনে পারসিউস আরও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'গরগন মেডুসার মাথাকেই নিয়ে আসব আপনার কাছে।'

পলিদেকতিস পারসিউসকে সমূহ বিপদে ফেলার জন্য বললেন, 'বেশ, সকল সভাসদ ও অতিথিরা সাক্ষী, তুমি যদি আজ থেকে সাত-দিনের মধ্যে গরগন মেডুসার মাথা আমার কাছে না নিয়ে আসতে পার, তাহলে মৃত্যুদণ্ড হবে তোমার।'

পারসিউস গরগন মেডুসার সম্পর্কে সঠিক কিছু জানত না। কিন্তু তার একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, সে যে কোন দুঃসাধ্য কাজ করতে পারবে।

মার কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ পাথেয় করে সেইদিনই পারসিউস গরগনের সন্ধানে অজানা জগতের উদ্দেশে ঘর ছাড়ল। পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে পাহাড়ী মানুষদের কাছে জানতে পারল যে তিনটি গরগনের কথা তারা শুনেছে, কিন্তু তারা দেখে নি কখনও তাদের। তবে যদি কেউ কোন গরগনকে দেখে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে পাথরে পরিণত হবে, এইটুকুই জানে

তারা। কেউ কেউ বলল পারসিউসকে, গরগনের চামড়াটা মাছের আঁশের মত বড় বড় আঁশ দিয়ে মোড়া। কেউ আবার বলল, তাদের হাত দুটো পাখির পায়ের মত, আর পা দুটো তাদের সিংহের পায়ের মত। কেউ আবার বলল, গরগনেরা আকাশে উড়ে যেতে পারে। দুটো করে ডানা আছে তাদের, আবার কেউ বলল, না, তা জানা নেই তাদের। তবে গরগন মেডুসার সম্পর্কে পারসিউস লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল যে, সেই তিন গরগনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মেডুসা। মেডুসা আসলে ছিল এক সুন্দরী নারী। তার অপরূপ সোনালী চুলের গুচ্ছের জন্য অহংকারের সীমা ছিল না তার। দেবী মিনার্ভা তা সহ্য করতে না পেরে তাকে একটা গরগনে পরিণত করেন এবং তার মাথার প্রতিটি চুলকে এক একটি সাপে পরিণত করেন।

দীর্ঘপথ চলার পর গরগনের বাসস্থানের কোন সন্ধান না পেয়ে পারসিউস সমুদ্রের উপকূলে এক পাহাড়ের উঁচু একটি ধাপে উঠে বসে পড়ল। সেখানে বসে বসে ভাবতে লাগল কিভাবে সেই গরগনের সন্ধান পাওয়া যাবে, আর পাওয়া গেলেই বা কিভাবে তাকে সে বধ করবে। সেই সময় একখণ্ড রূপালি মেঘ বহুদূর থেকে ক্রমশ ভেসে আসতে লাগল যেন তারই দিকে, লক্ষ্য করল পারসিউস। শেষে সত্যিই মেঘখণ্ডটি তার সামনে এসে স্থির হয়ে গেল এবং সেই মেঘের ভিতর থেকে সশরীরে দুজন তরুণ-তরুণী বেরিয়ে এলেন।

তরুণীটি দীর্ঘাঙ্গি ও সুন্দরী এবং তাঁর ধূসর আয়ত দুটি চোখ তাঁকে মোহময় করে তুলেছে। কিন্তু পারসিউস তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে চমকিয়ে উঠল। সে এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! পারসিউসের ভিতরের সব কথাই যেন তার জানা। শিরস্ত্রাণে চুল ঢাকা পড়েছে মেয়েটির। তার শ্বেতশুভ্র সেমিজের ওপর ব্যাঘ্রচর্মের ওড়না রয়েছে, তাঁর কাঁধে ঝোলানো ঝকঝকে একটি ফলক। তরুণটিকে বন্ধুভাবাপন্ন বলেই মনে হল পারসিউসের। কিন্তু তাঁর চোখেও যেন আগুন জ্বলছে মনে হল তার। একটা ছোট তরোয়াল ছিল তার কাছে। দুজনের পায়ে

রয়েছে ডানা, তাতে ভর দিয়ে ছুটে যেতে পারে তাঁরা অসীম অনন্তে!

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হারকিউলিস শুনতে পেল, তরুণীটি বলছে, 'আমি মিনার্ভা আর এই আমার ভাই মারকারি। তোমার পিতা দেবরাজ জুপিটার এখানে তোমার কাছে পাঠিয়েছে আমাদের। আমরা জানতে চাই, তুমি কি ঠুন্‌কো একটা মাটির পুতুল না প্রকৃতই একজন বীর নায়ক? যে মানুষ মাটির পুতুল সে কেবলই পেতে চায় ভোগসুখ, যে পথেই হোক, ধনরত্ন বৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য তার। কিন্তু তারা যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, কেউই তাদের আর মনে রাখে না। কিন্তু যাঁরা পৃথিবীতে নিজেদেরকে প্রকৃত নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের মাঝে, নিজেদের সমর্পণ করে মানুষ ও দেবতাদের প্রীতি অর্জনে, মৃত্যুর পরেও মানুষের মনের কোণে অহরহ আসীন থাকেন তাঁরা। তাঁদের স্মৃতি মানুষের মনে অক্ষয় অম্লান থাকে। দেবতারাও তাঁদের তারিফ করেন। পারসিউস, তুমি কি হতে চাও? মাটির পুতুল না প্রকৃত নায়ক?' পারসিউস কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বলল, 'পরীক্ষা করেই দেখুন না।'

তখন মারকারি পারসিউসকে সম্বোধন করে বললেন, 'মিনার্ভা যা যা বললেন, তুমি যদি তা প্রতিপালন করতে পার তাহলে তুমি রাজা পলিদেকতিসকে গরগনের মাথা উপহার হিসাবে দিতে পারবে।'

পারসিউস অঙ্গীকার করল, তাঁরা যা বলবেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে।

তখন মিনার্ভা তাকে বললেন, 'জুপিটার তাঁর উপযুক্ত সন্তান হিসাবে তোমাকে দেখতে চান। আজ রাতেই তুমি রওনা হবে। প্রথমেই উত্তর অভিমুখে পাড়ি দিয়ে শীতল উত্তুরে বাতাসের দেশে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে সেই বরফ-শীতল দেশে ধূসরবর্ণ তিন বোনের দেখা পাবে। তাদের তিনজনের মিলিতভাবে একটি মাত্র চোখ ও একটি মাত্র দাঁতই সম্বল। উড়ন্ত পাদুকা, যাদুথলে এবং আঁধার জগতের শিরস্ত্রাণ পাওয়ার জন্য তুমি তার কাছে বনপরীদের খোঁজ করবে। প্রথমে তুমি তিন বোনের চোখটি তুলে নেবে। ঐ একটি

চোখেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনজনে দেখে। তুমি ঐ চোখ তাদের ফিরিয়ে দেবে না যতক্ষণ না তারা ঐ তিনটি জিনিসের সন্ধান দেয়। বনপরীরা তোমাকে জানাবে কোথায় গরগনের সন্ধান পাওয়া যাবে। গরগনদের সম্বন্ধে লোকেরা বিচিত্র গল্প বলে কত। কিন্তু তার সবটাই বানানো। কেননা, গরগনকে যে দেখবে সে তো আর প্রাণে ফিরে আসতে পারবে না। গরগনকে যে দেখবে সেই মুহূর্তে পাথরে পরিণত হবে সে।'

পারসিউস সব শুনে বলল, 'গরগনদের দেখামাত্রই যদি প্রস্তরীভূত হতে হয় তাহলে মেডুসাকেই বা চিনব কি করে, মেডুসার মুণ্ডচ্ছেদই বা করব কি করে ?'

মিনার্ভা তার কাঁধ থেকে ঝোলানো ফলকটি তুলে নিয়ে পারসিউসকে দিয়ে বললেন, 'উজ্জ্বল আয়নার মত প্রতিসরণকারী এই ফলকটি তোমাকে দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার পিতা। এই ফলকের মধ্য থেকে গরগনদের দেখতে পাবে, কিন্তু ভুলেও কখনও গরগনদের দিকে তাকাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তুমি পাথরে পরিণত হবে।'

মারকারি পারসিউসের হাতে একটি তরোয়াল তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমার পিতার দেওয়া এই তরোয়াল দিয়েই মেডুসার মাথা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।'

পিতার ফলকটিকে পারসিউস তার গলায় ঝুলিয়ে রাখল। পিতার দেওয়া তরোয়াল আর ফলকটি পেয়ে একটা অদ্ভুত শক্তি ভর করল তার উপর। নিজেকে অনেক বেশি শক্তিমান বলে মনে হল তার। আত্মবিশ্বাস হল তার, মেডুসার মাথা সে কাটতে পারবে।

তখন পারসিউস মিনার্ভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানতে চাইল তাঁদের কাছে এই অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে কি দিলে তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন।

মিনার্ভা বললেন, 'মেডুসার মাথাটাই প্রতিদান হিসাবে দিতে পারবে আমাদের। রাজাকে যখন মেডুসার মাথাটাকে উপহার হিসেবে দেবে, রাজার কোন কাজেই লাগবে না সেটি। ওটি তখন তুমি আমাকেই দিয়ে দেবে।'

মিনার্ভা ও মারকারির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পারসিউস কনকনে ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাসের দেশে রওনা হল। দিন যায়, মাস যায়, চলার আর তার শেষ নেই। উত্তরোত্তর শীতল আর অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর জগতে পাড়ি দিয়ে চলল সে। অবশেষে উত্তুরে বাতাসের দেশে এসে পৌঁছাল সে। সেখানে এসে ছাখে সমুদ্রের তীরে তিনটি পাথরের চাঁইয়ের ওপর তিন বোন বসে আছে। মিনার্ভা যে তিন বোনের কথা বলেছিল তারাই এরা, বুঝল পারসিউস। তিনজনই কুৎসিত-দর্শন, চুলগুলো তাদের বরফের মত সাদা, আঙ্গুলগুলো তাদের পাতলা, লম্বা। বৃষ্টিঝঞ্ঝাসঙ্কুল দিনে বাতাস যেমন ঝাপটা মেরে তোলপাড় করে তোলে বৃষ্টিধারাকে, তিনকন্থার ফিনফিনে ধূসর মলমলের ঢেউ খেলানো দেহবাসেও ঠিক তেমনই অশান্ত নাচন খেলে যায় শীতের তীরবেঁধা কনকনে হাওয়ার দাপটে।

পারসিউস দেখল, একটি মেয়ের কপালের মাঝখানে বড় একটি উজ্জ্বল চোখ। তিন জনের কপালেই চোখ বসাবার জন্ত একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। এই একটি চোখের সাহায্যেই তিনজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তিনটি মেয়ের মধ্যে যার কপালে চোখ বসানো ছিল সে পারসিউসকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইল কি চায় সে। পারসিউস তার কাছে বনপরীদের সন্ধান জানতে চেয়ে বলল, বনপরীদের কাছ থেকে উড়ন্ত পাতুকা, যাত্নথলে এবং আঁধার-শিরস্ত্রাণ নিতে হবে তাকে। দেবী মিনার্ভা তাকে পাঠিয়েছেন তাদের কাছে, এও জানাল পারসিউস।

পারসিউসের কথা শুনে অপর একটি মেয়ে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে প্রথম জনের কপাল থেকে চোখটি তুলে নিয়ে নিজের কপালে বসিয়ে পারসিউসকে ভালভাবে দেখল। তৃতীয় মেয়েটিও দ্বিতীয় মেয়েটির কপাল থেকে চোখটি তুলে নিজের কপালে বসিয়ে পারসিউসকে দেখল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্ত। কিন্তু তারা কিছুতেই বনপরীদের সন্ধান দিতে চাইল না পারসিউসকে। পারসিউস তখন তাদের তিন জনের একমাত্র চোখটিকে তুলে নিয়ে রাখল নিজের

হাতে। বনপরীদের সন্ধান না দিলে ঐ চোখ তাদের দেবে না বলল সে। চোখ হারাবার ভয়ে তারা তখন বাধ্য হয়েই বনপরীদের সন্ধান দিল। বলল তারা পারসিউসকে, দূর দক্ষিণ দিগন্তে যে বিস্তৃত বন রয়েছে, সেখানে এক গাছের উপরে থাকে সেই বনপরীরা। পৃথিবীর ভর কাঁধে নিয়ে এ্যাটলাস যে সুউচ্চ পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই পাহাড়ের নীচেই সেই বন, বলল সেই তিনকন্যা।

চোখটি তাদের ফেরত দিয়ে দক্ষিণের দিকে রওনা হল পারসিউস। এবারে সে যতই দক্ষিণের দিকে এগোতে লাগল, উত্তরোত্তর গরম আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ল সে। এরপরে পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে শেষে সে এ্যাটলাসকে এক আকাশছোঁয়া পাহাড়ের ওপর দেখতে পেল। পাহাড়ের চূড়ায় পৃথিবীকে সে কাঁধের উপর ধারণ করে আছে। পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পারসিউস এক জায়গায় সমবেত কণ্ঠে মধুর গান শুনতে পেল এবং তারপরেই দেখল একদল মেয়ে গান গেয়ে নৃত্য করছে ; পারসিউসকে দেখেই তারা তাকে নাচে যোগ দিতে বলল।

পারসিউস বলল, 'আমার আনন্দ করার সময় নেই। আমি এখানে একটি জরুরী কাজে এসেছি। আমার প্রয়োজন উড়ন্ত পাদুকা, ঝাদুথলে এবং আঁধার-শিরস্ত্রাণ।'

সেকথা শুনে নাচ থামিয়ে বনপরীরা বিমূঢ় বিস্ময়ে পারসিউসের দিকে চেয়ে রইল। অল্পক্ষণ পরেই তারা সবিস্ময়ে জানতে চাইল কে তাদের বলল যে জিনিসগুলোর সন্ধান তারা জানে। উত্তরে পারসিউস বলল, 'দেবী মিনার্ভাই তাকে একথা বলেছেন।' তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'কি জন্য প্রয়োজন তার এই জিনিসগুলোর।' পারসিউস উত্তর দিল, 'গরগন মেডুসার শিরচ্ছেদনের জন্য তার এগুলো প্রয়োজন।' বনপরীরা তা শুনে বলল, খুড়ো এ্যাটলাসের সঙ্গে তাদের কথা বলতে হবে।

পারসিউসকে নিয়ে বনপরীরা এবার সেই সুউচ্চ পাহাড়ে যেখানে এ্যাটলাস দাঁড়িয়ে আছে তার সানুদেশে এসে পোঁছোল।

এ্যাটলাসকে উদ্দেশ করে পারসিউস বলল, 'গরগনরা কোথায় থাকে তা জানতে এসেছি তোমার কাছে। গরগন মেডুসার মাথা কাটব আমি। দেবরাজ জুপিটার আমার পিতা। তার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি আমি।'

এ্যাটলাস তখন পাহাড়ের উপর থেকে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি জানি গরগনেরা কোথায় থাকে। কিন্তু তাদের তুমি দেখতে পাবে না। তাদের দেখলেই তুমি পাথরে পরিণত হয়ে যাবে।'

তখন এ্যাটলাসকে পারসিউস যাবতীয় ঘটনার কথা বলল। কেন সে মেডুসাকে হত্যা করতে চাইছে, কিভাবে সে জুপিটারের তরোয়াল ও ফলক পেয়েছে, কেমন করে সে উড়ন্ত পাদুকা, যাদুথলে এবং আঁধার শিরস্ত্রাণের সন্ধান পেয়েছে। বনপরীদের কাছেই সে এ্যাটলাসের কাছে যাওয়ার পথনির্দেশ পেয়েছে, তাও বলল।

সব শুনে এ্যাটলাস বনপরীদের নির্দেশ দিল পারসিউসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে আসতে। উড়ন্ত পাদুকা এবং যাদু-থলে বনপরীদের হেফাজতেই ছিল, আঁধার জগতের শিরস্ত্রাণ তারা পাতালপুরীর রাজা প্লুটোর কাছ থেকে নিয়ে এল।

পারসিউসকে বনপরীরা প্রথমে উড়ন্ত পাদুকা দিল। পারসিউস ঐ পাদুকা পরে শোঁ করে এ্যাটলাসের মাথার কাছে চলে এল। এ্যাটলাস তখন পারসিউসকে বলল, 'এই পাদুকা পরে তুমি যেখানে খুশী যেতে পার, কিন্তু সাবধানে এটিকে নিয়ন্ত্রিত করবে। আবার পারসিউস বনপরীদের কাছে উড়ে এল। তারা এবার তাকে দিল সেই যাদুথলেটি। এ্যাটলাস পারসিউসকে বলল, 'তুমি এই থলিতে যা রাখতে চাইবে তাই পারবে।' তারপর বনপরীরা পারসিউসকে আঁধার-শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দিল। পারসিউস সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। অ্যাটলাস আর বনপরীরা তখন চিৎকার করে বলল, 'পারসিউস তুমি কোথায়?' পারসিউস বলল, 'এই তো আমি।' তখন এ্যাটলাস বলল, 'পারসিউস, তুমি যতক্ষণ এই শিরস্ত্রাণ পরে থাকবে ততক্ষণ তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ তুমি সবাইকে দেখতে পাবে।'

পারসিউসকে এবার এ্যাটলাস তার মাথার ওপর উঠে আসতে বললেন। অদৃশ্য পারসিউস মুহূর্তে তার মাথার উপরে উঠে জানান দিল যে সে এ্যাটলাসের মাথার কাছে এসেছে। তখন এ্যাটলাস তাকে বলল, 'তোমাকে আমি এবার গরগনদের সন্ধান দেব। দূরে বহুদূরে—দূর দিগন্তে সূর্যের আরোহণ শুরু হবে যেখানে, সেখানে নীল সমুদ্রের বুকে এক ছোট দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট, গরগনেরা সমুদ্রের বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে পাশাপাশি—গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তারা। মেডুসা গরগনদের মাঝে রয়েছে। শোন পারসিউস, তোমাকে গরগন মেডুসাকে বধ করতে সাহায্য করব। কিন্তু একটা শর্তে, তুমি যখন মেডুসার মাথাটা কেটে নিয়ে এখান দিয়ে যাবে, তখন একবার আমাকে তার ছিন্ন মাথাটি দেখাবে, তাহলেই আমি প্রস্তরীভূত হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বদ্ধ হয়ে যাব। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর ভার কাঁধে রেখে দাঁড়িয়ে আছি; এখন আমি পাহাড়ের সত্তা গ্রহণ করতে চাই। তুমি একবারটি আমাকে মেডুসার ছিন্ন মস্তকটি দেখিও।'

পারসিউস এ্যাটলাসকে আপ্রাণ চেষ্টা করল বোঝাতে যাতে সে এই মর্মবিদারক কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এ্যাটলাস অনড়, তার ইচ্ছা পারসিউসকে পূরণ করতেই হবে। পারসিউস উপায়ন্তর না দেখে এ্যাটলাসকে বাধ্য হয়ে কথা দিল যে মেডুসার ছিন্নমস্তক দেখাবে তাকে। এ্যাটলাস তখন খুশী হয়ে যেতে বলল পারসিউসকে গরগনদের কাছে। এ্যাটলাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে পারসিউস তার উড়ন্ত পাদুকার ভরে দূরদিগন্তে সেই দ্বীপের উদ্দেশে তীব্রগতিতে ছুটে চলল—পায়ে উড়ন্ত পাদুকা, হাতে তরোয়াল আর যাদুথলে, মাথায় আঁধার-শিরস্ত্রাণ, গলায় ঝোলানো তার ফলক।

অদৃশ্য পারসিউস আকাশের অনেক উঁচুতে শূন্যে ভাসতে ভাসতে গাঙচিলদের মাঝে এসে পড়ল, বুঝল সে কাছেই সমুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল সাপেদের কর্কশ ফোঁস ফোঁস আওয়াজ। সেই আওয়াজ শুনে পারসিউস লক্ষ্য করল গরগনদের দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছে সে; সমুদ্র-তটে এক গরগনের মাথায় কিলবিল করছে

সাপেরা, লক্ষ্য করল সে আকাশ থেকে জুপিটারের দেওয়া ফলকের মধ্য দিয়ে। নীচে মুখ নামিয়ে গরগনদের দিকে ভুলেও তাকাল না সে; মিনার্ভা, মারকারি এবং এ্যাটলাসের কথা সে সবসময় মনে রেখেছিল, গরগন মেডুসাকে দেখলেই যে সে পাথরে পরিণত হয়ে যাবে, সদা-সতর্ক ছিল সে এ ব্যাপারে।

এবারে একটু নীচে নেমে এসে তার পিতা জুপিটারের দেওয়া সেই আরশি-ফলকটি চোখের সামনে রেখে দেখল তিনটি গরগন সমুদ্রতটে শুয়ে আছে নিদ্রিত অবস্থায়। এবারে সে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে তাদের। এত ভয়ঙ্কর কদর্য তাদের চেহারা যে পারসিউস বিস্ময়ে হতভম্ব গেল। গয়গনদের গায়ের চামড়া মাছের আঁশের মত দেখতে বড় বড় আঁশে মোড়া—একথা বলেছিল যারা তাদের কথা এখন দেখল সে ঠিকই। সূর্যের আলোয় চকচক করছিল তাদের সেই কিম্ভূত-কিমাকার গায়ের চামড়া। তাদের ডানাগুলোকে বালির উপর ছড়িয়ে রেখেছিল। ফলকটিতে আরও দেখল সে হাতদুটো তাদের দেখতে বিরাট পাখির পায়ের মত। পারসিউস মনে মনে ভাবল যদি গরগনেরা একবার তাকে দেখতে পায় তারা তাদের হাতের ধারালো নোখ দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে তাকে। কিন্তু এ্যাটলাসের দেওয়া আঁধার-শিরস্ত্রাণ মাথায় থাকায় সে নিশ্চিন্ত ছিল যে তার অস্তিত্ব গরগনেরা টের পাবে না। পারসিউস একদৃষ্টিতে ফলকটির দিকে তাকিয়ে ছিল হঠাৎ দেখল মাঝের গরগনটি একটু নড়ে পাশ ফিরল। এই গরগনটির মাথার সাপগুলি দেখে পারসিউস বুঝতে পারল এই হল মেডুসা। পারসিউস প্রস্তুত হল ঘুমন্ত অবস্থাতেই মেডুসাকে আঘাত করতে। আকাশপথে নিঃশব্দে নেমে এল সে গরগনদের মাথার উপরে কাছাকাছি। গরগনরা তার উপস্থিতি বুঝতেই পারল না। পারসিউস তার তরোয়াল উঁচিয়ে ধরলে মেডুসার মাথায় সাপেরা নড়েচড়ে উঠল এবং আরও জোরে ফোঁসফোঁস করতে লাগল, কিছু একটা আওয়াজ পেল বুঝি তারা। বিপদের আশঙ্কায় কর্কশ স্বরে গরগনদের জাগাবার চেষ্টা করল তারা

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পারসিউসের তরবারি মেডুসাকে দ্বিখণ্ডিত করল। মেডুসার ধড় ও মাথা আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ল বালির ওপর। মুহূর্ত-মধ্যে পারসিউসস তার যাদুথলিটিকে মেডুসার মাথার কাছে নিয়ে গেল। অসংখ্য সাপ-জড়ানো মেডুসার মাথাটি আপনা থেকেই যাদুথলিটির মধ্যে ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যাদুথলেটির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে পারসিউস তার উড়ন্ত পাদুকায় ভর দিয়ে দুরন্ত গতিতে নীচ থেকে উপরে উঠে গেল নিঃসীম আকাশে। আকাশ থেকে ফলকের মধ্য দিয়ে পারসিউস দেখল অন্য দুটো গরগন জেগে উঠে মেডুসার খণ্ডিত দেহ দেখে উন্মত্তের মত লাফালাফি করছে সমুদ্রতটে। তারপরেই দেখল গরগনদুটো শূন্যে ডানা মেলে চারিদিকে চক্কর মেরে দেখছে ঘাতকের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। পারসিউসের চলার গতি আরও বেড়ে গেল। রাজা পলিদেকতিস যা উপহার চেয়েছিল তাই নিয়ে সে এখন ফিরে চলল মনের ফুর্তিতে। বনপরীদের শিরস্ত্রাণ ফিরিয়ে দিতে এবং এ্যাটলাসকে মেডুসার মাথা দেখাতে সে এ্যাটলাসের পায়ের নীচে এসে কিছুক্ষণের জন্য থামল। বনপরীরা ভীষণ খুশী হল মেডুসার মাথাটি নিয়ে পারসিউসকে ফিরে আসতে দেখে। পারসিউস বনপরীদের আঁধার-শিরস্ত্রাণ ফেরত দিয়ে বলল,এবার লুকোতে হবে তাদের, কেননা মেডুসার মাথাটিকে কথামত এ্যাটলাসকে দেখাতে হবে। বনপরীরা যদি মেডুসার মাথাটাকে দেখে ফেলে তাহলে নির্ঘাত পাথরে পরিণত হবে তারা! তাই শুধুমাত্র এ্যাটলাসকেই মেডুসার মাথাটাকে দেখাল সে। এ্যাটলাস সঙ্গে সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের অভিলাষ অনুযায়ী পাহাড়ের অঙ্গীভূত হয়ে গেল—পাথরে পরিণত হয়ে যে পাহড়ের উপর সে দাঁড়িয়েছিল সেই পাহাড়ের অংশরূপে বিরাজ করছে এখনও সে—সেই পাহাড়ের নাম মাউন্ট এ্যাটলাস।

পারসিউস এ্যাটলাস-পর্বত থেকে এবার সরাসরি দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিয়ে উড়ে চলল বনপরীদের দেওয়া সেই পদুকায় ভর দিয়ে। কিছুটা পথ চলার পর দিনের অবসানে অন্ধকারের পর্দা নেমে

এল। আঁধার রাতের মধ্য দিয়েও তার চলার বিরাম ছিল না। উষার দেবী অরোরা এবারে ধীরে ধীরে আঁধারের যবনিকা তুলে ফেললেন। ভোরের আলোয় পারসিউসকে তিনি চলে যেতে দেখলেন জল-স্থলের উপর দিয়ে।

ঠিক সেই সময় পারসিউস নীচ থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। তার মনে হল যেন একটা মেয়ের করুণ আর্তনাদ। না কি তার মনেরই ভুল, ভাবল সে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ নয় তো। মাটির দিকে কিছুটা নেমে এসে পারসিউস দেখলে সমুদ্রের পাড়ে একটা বিরাট পাথরের সঙ্গে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছে এক অপরূপা সুন্দরী মেয়েকে। সাদা ফিনফিনে সেমিজ মেয়েটির গায়ে, এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার কাঁধে, চোখের জলে ভিজে গেছে তার শুকনো মলিন মুখ, সমুদ্রের জল গড়িয়ে এসে তার পায়ে আছড়ে পড়ছে অবিরাম। কি মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য! পারসিউস বিচলিত হয়ে পড়ল। মেয়েটির কাছে নেমে এল সে। মেয়েটি ভাবল, এ কি কোন দেবদূত আবির্ভূত হয়েছেন তার কাছে! পারসিউস বলল তাকে 'আশ্চর্য হোয়ো না। আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। আমি এক অভিযান শেষ করে ফিরে যাচ্ছি নিজের দেশ ক্রিটে। আমার ডানাওয়ালা পাদুকায় ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম আকাশপথে। উপর থেকে বাতাসে ভেসে আসা তোমার কান্নার আওয়াজ শুনে নেমে এলাম তোমার কাছে। বল আমায় নির্ভয়ে, তোমার এই অবস্থা হল কেমন করে? কেন তোমাকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছে?'

উত্তরে মেয়েটি চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সমুদ্রের উপকূলে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের আবির্ভাব হয়েছে। ভবিষ্যৎবাণী শুনতে পাওয়া গেছে নাকি যে, আমাকে যদি এই ড্রাগনের মুখে ঠেলে দেওয়া হয় তাহলে ঐ ড্রাগন আর কখনই এই দেশে এসে বিপদ সৃষ্টি করবে না। ড্রাগনটি তীরের কাছাকাছি সমুদ্রের জলে রয়েছে, তারই সন্তুষ্টির জন্য তার খাদ্য হিসাবে আমাকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমার নাম এ্যান্ড্রামিদে। আমার বাবা-মার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে এসে

এদেশের লোকেরা আমাকে ড্রাগনের মুখে সঁপে দেবার ব্যবস্থা করেছে।'
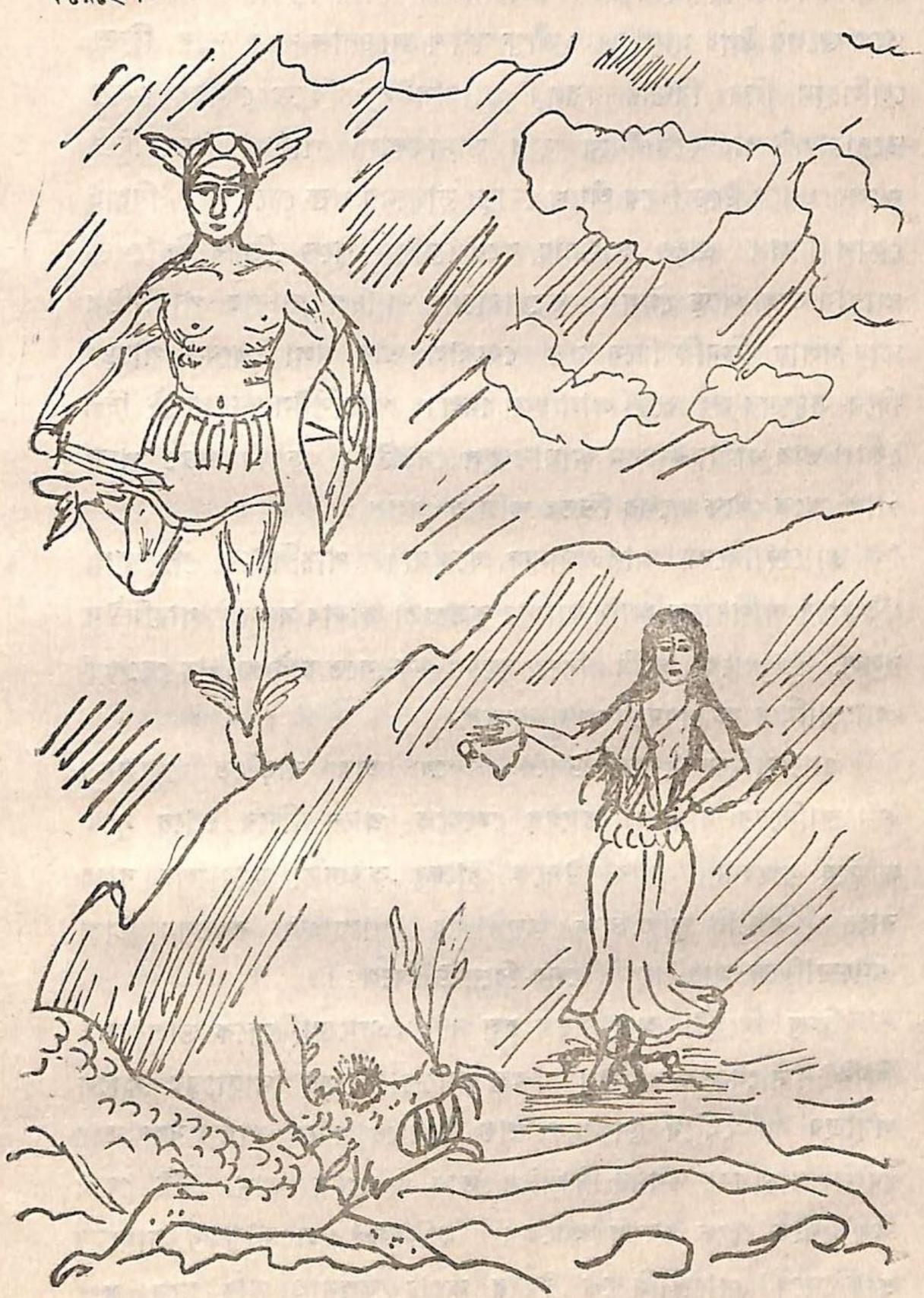
ঠিক সেই সময় পরপর কয়েকটা বড় বড় ঢেউ গুরুগম্ভীর গর্জন করে·

এসে ভেঙ্গে পড়ল এ্যান্ড্রোমিদের পায়ের কাছে। এক ড্রাগন সেই ঢেউয়ের পিছনে পিছনে এসে এ্যান্ড্রোমিদের দিকে নিশানা করে ভেসে এসে জলের উপর মাথা তুলে তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ করে তার হিংস্র লেলিহান জিব বিস্তার করল। পারসিউস চকিতে কোমর থেকে তরোয়ালটি বার করে নিয়ে তার ডানাওয়ালা পাদুকায় ভর দিয়ে জলের ওপরে উড়ে গিয়ে আঁশে মোড়া ড্রাগনের শক্ত দেহে এক বিরাট কোপ দিল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ড্রাগন শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে আবার জলে পড়ে গেল। তরোয়ালের ঘা দিল আবার পারসিউস তার গলায়, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল তার গলা থেকে—পাড়ের দিকে সমুদ্রের জল রক্তে লাল হয়ে গেল। পারসিউস তারপরেই দিল কোপ তার মাথায়—চরম আঘাত হল সেইটিই। ড্রাগন প্রচণ্ড শব্দে পাক খেতে খেতে জলের ভিতর তলিয়ে গেল।

এ্যান্ড্রোমিদের আর আনন্দ ধরে না। পারসিউকে সে বলল, 'কিভাবে আপনাকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাব বলুন।' পারসিউস বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করে নিয়ে যেতে চাই আমার দেশে।' এ্যান্ড্রোমিদে অধোবদনে মাথা নাড়লেন।

এ্যান্ড্রোমিদে পারসিউসকে নিয়ে তার বাড়ীতে গেলেন। এ্যান্ড্রোমিদের বাবা-মা তাদের মেয়েকে প্রাণে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পারসিউসকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানালেন বারে বারে। এলাহি ভূরিভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তাঁরা এ্যান্ড্রোমিদে আর পারসিউসের বিয়ে উপলক্ষ্যে।

কিন্তু বিয়েটা অত সহজ হল না। এ্যান্ড্রোমিদেকে ভালবাসত ফিনিউস নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু এ্যান্ড্রোমিদেকে পাহাড়ের কোলে সমুদ্রের গা ঘেঁযে ড্রাগনের খাদ্য হিসাবে বেঁধে রাখল যখন তার দেশের মানুষেরা, তখনই ফিনিউস তার জীবনের আশা নেই দেখে মন থেকে মুছে ফেলে তাকে। ফিনিউস ছিল কাপুরুষ, ড্রাগনের হাত থেকে এ্যান্ড্রোমিদকে উদ্ধার করার কল্পনাও তার মনে স্থান পায় নি। এখন যখন এ্যান্ড্রোমিদে মুক্ত হয়েছে, প্রাণ সংশয় নেই

আর এখন তার, তাই তার প্রতি ফিনিউসের পুরোনো ভালবাসা জেগে উঠল এখন। সে যখন শুনতে পেল পারসিউসের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিকঠাক, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এ্যান্ড্রোমিদের বিয়ের দিন অস্ত্রশস্ত্র সমেত লোকজনদের নিয়ে বিয়েবাড়ীতে আক্রমণ চালাল। সমাগত অতিথিরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। পারসিউস তখন বিপদ বুঝে পিতা জুপিটারের দেওয়া যাদুথলিটি কোমর থেকে তুলে ধরে বলল অভ্যাগত অতিথি এবং হামলাকারীদের উদ্দেশে, 'আমি থলিটিকে মাথার ওপর তুলছি, আপনারা মাথা ঘুরিয়ে চোখ ফিরিয়ে রাখুন। কেউ এই থলিটির দিকে ভুলেও তাকাবেন না।' আমন্ত্রিত অতিথিরা পারসিউসের কথায় চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল কিন্তু ফিনিউস আর তার অনুচরেরা প্রবল আক্রোশে পারসিউসের দিকে ধেয়ে গেল। ফিনিউস পারসিউসকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়তে হাত তুলল। থলেটির মধ্যে মেডুসার মুখটি দেখে ফিনিউস ও তার অনুচরেরা যে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল সেই অবস্থাতেই তারা পাথরে পরিণত হয়ে গেল। সমবেত অতিথিরা পারসিউসের কথা অনুযায়ী থলেটির দিকে না তাকানোর ফলে তাদের কোন ক্ষতিই হল না। তারা হতবাক বিস্ময়ে দেখল প্রস্তরীভূত ফিনিউস আর তার অনুচরদের।

আনুষ্ঠানিক বিয়ে ও ভোজ-অনুষ্ঠানের পর এ্যান্ড্রোমিদকে কাঁধে তুলে উড়ন্ত পাদুকায় ভর দিয়ে আকাশ-পথে পাড়ি দিয়ে ফিরে এল দেশে পারসিউস। এ্যান্ড্রোমিদকে নিয়ে পারসিউস তার মা ড্যানের কাছে এসে উঠল। ড্যানে ও দিকতিস একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল, তারা ধরে নিয়েছিল পারসিউস আর জীবিত নেই। পারসিউসকে ফিরে পেয়ে এবং তার সঙ্গে এ্যান্ড্রোমিদকে দেখে আনন্দের আর সীমা রইল না তাদের। দিকতিস এবং মা ড্যানেকে বিস্তৃতভাবে তার অভিযানের কথা বলল পারসিউস। রাজা পলিদেকতিসের খবর জানতে চাইল সে মার কাছে। ড্যানে বললেন, পলিদেকতিসের দুষ্টস্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় নি। জানালেন ছেলেকে তিনি যে পরদিনই পলিদেকতিস তার প্রাসাদে একটি ভোজ

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেখানে আমন্ত্রিত সকলেই উপহার নিয়ে যাবে। পারসিউসকে আরও বললেন তার মা, 'পলিদেকতিস তোমাকে ভোলে নি। প্রতি মাসে সে তোমার খোঁজ নিত। তুমি উপহার নিয়ে ফিরে এসেছ কিনা জানতে আসত প্রায়ই। এবারে সে বলে গেছে যদি পারসিউস পরের দিনের ভোজ-অনুষ্ঠানে মেডুসার মাথা উপহার হিসাবে না নিয়ে আসতে পারে তাহলে রাজ্য জুড়ে ঘোষণা করা হবে যে পারসিউস জীবিত নেই। জান পারসিউস কাল আমাকে তার প্রাসাদের ভোজ-অনুষ্ঠানে যেতে হবে। পলিদেকতিসের হাতে অবমাননার জ্বালা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আত্মঘাতী হবই।'

পারসিউস মাকে অভয় দিয়ে বলল, 'কালই ভোজ-অনুষ্ঠানে আমি পলিদেকতিসকে মেডুসার খণ্ডিত মাথা উপহার হিসেবে দেব।'

পরের দিন পারসিউস যাদুথলিতে মেডুসার মাথাটিকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল। সে তার মা ড্যানে ও দিকতিসকে বাড়ীতে থাকতে বলল। প্রাসাদের উৎসব-কক্ষটি দুষ্ট রাজার বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য অভ্যাগতদের ভিড়ে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। পারসিউসকে কেউ চিনতে পারল না। কেননা, এই ক'বছরে তার চেহারায় আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছে। রাজা পলিদেকতিস সেই কক্ষে ঢুকে নিজের আসনে বসলেন। একে একে সকলেই তাঁদের উপহার দিল রাজাকে। সর্বশেষ থাকল পারসিউস। পারসিউসকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ভাল করে দেখে রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন—'এই সেই ছেলেটি যাকে আমার ভাই সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল। সে নিশ্চয়ই আমাকে বলতে এসেছে যে সে তার কথামত উপহার আনতে পারে নি।'

'না, আপনার কথা ঠিক নয়। আমি আপনার সেই ঈপ্সিত উপহার এনেছি। যাঁরা সৎ লোক, ঈশ্বর তাঁদের সবসময় সাহায্য করেন আর যারা মন্দ লোক, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেন ঈশ্বর। আমি গরগন মেডুসার মাথা নিয়ে এসেছি।'

উপস্থিত সকল লোকই পারসিউসের এই কথায় বিশ্বাস করতে

পারল না। তারা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'ছ্যাখ, এ আবার কিসের মাথা এনেছে!' রাজাও অবিশ্বাস করল তার কথা। পারসিউসকে বললেন তিনি, 'দেখি কতবড় ঠগ তুমি, আমাকে দেখাও গরগন মেডুসার মাথা, দেখাতে না পারলে তোমার গর্দান নেব এখুনিই।'

পারসিউস চোখ বন্ধ রেখে যাদুথলে থেকে গরগন মেডুসার মাথাটাকে তুলে নিয়ে রাজাকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হল সেই কক্ষে এবং রাজা ও উপস্থিত প্রতিটি মানুষ রূপান্তরিত হল ধূসর পাথরে।

মেডুসার মাথাটাকে থলের মধ্যে ঢুকিয়ে চোখ খুলে ছ্যাখে পারসিউস, কক্ষের প্রতিটি মানুষ নিথর পাথর হয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মূর্তিগুলো পেরিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পারসিউস সোজা মার কাছে চলে এল। মা ছ্যানে এবং দিকতিসকে বলল সে, সেরিফোস দ্বীপে আর কোন দিনই কোন দুষ্ট রাজার স্থান হবে না। পারসিউসের প্রস্তাব অনুসারে দেশের মানুষ সর্বসম্মতি ক্রমে দিকতিসকেই সেরিফোস দ্বীপের রাজার পদে অভিষিক্ত করল।

মিনার্ভা ও মারকারি আবার রূপালি মেঘের আড়াল থেকে আবির্ভূত হয়ে পারসিউসকে অভিনন্দন জানালেন। জুপিটারের তরোয়াল, ফলক, উড়ন্ত পাদুকা ও যাদুথলেটি ফিরিয়ে দিল তাঁদের কাছে পারসিউস। পারসিউসের কৃতিত্বে খুবই খুশী হয়ে তার পিতা দেবরাজ জুপিটার তাকে আশিস জানিয়েছেন, বললেন তাঁরা। আবার মিনার্ভা ও মারকারি রূপালি মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেলেন। পারসিউসের কৃতিত্বের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সিক্স্ ও হ্যালসিয়ন

প্রাচীনকালে সিক্স্ নামে এক রাজা ছিলেন। রানীর নাম ছিল হ্যালসিয়ন। এই রাজারাণীর আমলে দেশ সুখসমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছিল। স্বভাবতই রাজারাণীর মন আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনা তাদের জীবনকে ওলটপালট করে দিল।

সিক্স্-এর ভাই, সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল যে মানুষটি, মারা গেল আকস্মিক নিয়তির বিধানে। সিক্স্ হ্যালসিয়নকে বললেন যে বিনা অসুখে তার ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর আশঙ্কা হয়েছে যে দেবতা তার প্রতি কোনো কারণ রুষ্ট হয়েছেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন যে তিনি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দূর ক্ল্যারোস প্রদেশে যাবেন ভবিষ্যৎ-বক্তার মন্দিরে ভবিষ্যৎ-বাণী শুনতে। হ্যালসিয়ন সেখানে যেতে তাঁকে নিষেধ করলেন। হ্যালসিয়ন পবনদেবতার কন্যা ছিলেন তাই তিনি জানতেন সমুদ্রের ঝড় কি ভয়ঙ্কর ও বিপদজ্জনক হয়। তিনি স্বামীকে বললেন তাঁর ধারণা তাঁদের ওপর দেবতাদের রুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু সিক্স্ হ্যালসিয়নের কথায় কর্ণপাত না করে ক্ল্যারোসের উদ্দেশে জাহাজে পাড়ি দিলেন।

জাহাজ সমুদ্রের ভিতরে কিছুটা এগিয়ে গেলে সমুদ্রে প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ঝঞ্ঝার দাপটে সিক্স্-এর জাহাজ টলমল করে উঠল। সমুদ্রের ঢেউ ফুলে ফেঁপে উঠে জাহাজটিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের কোলে পাহাড়ের গায়ে সজোরে আছড়ে দিল। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল জাহাজটি। রাজা সিক্স্ ক্ষতবিক্ষত হয়ে জলে ডুবে মারা গেলেন।

হ্যালসিয়ন স্বামীর জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে স্বামীর কোন খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী, রাণী জুনোর কাছে হ্যালসিয়ন তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য একান্তে করুণ প্রার্থনা জানালেন। জুনো ভক্তের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর দূত ইরিসকে নিদ্রা-দেবতা সোমনুসের কাছে গিয়ে বলতে বললেন যে সিক্স্-এর আত্মাকে তিনি যেন হ্যাল-সিয়নের কাছে পাঠান সিক্স্-এর নিজের মৃত্যুর খবর দিতে।

ইরিস তার রামধনু-রঙা নকসাকাটা সেমিজে নিজেকে রমণীয় করে চললেন সোমনুসের অন্ধকারময় ধোঁয়াটে গুহায়। সোমনুসের আঁধার গুহায় কারোরই প্রবেশ করার শক্তি ছিল না। এমন কি সূর্যদেবতা এপোলোও সোমনুসের অন্ধকার গুহাকে সমীহ করতেন। অলিম্পাসের রাণী জুনোর নির্দেশ বলে ইরিস সোমনুসের আঁধার-পুরীতে ঢুকতে সমর্থ হয়েছিলেন। নতুবা তার পক্ষে সেখানে ঢোকা সম্ভব ছিল না। সেই অন্ধকারময় গুহার এক কোণে সামান্য মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল একরাশ মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে স্থির হয়ে আছে। ভোরের আলোয় কোঁকর-কোঁ আওয়াজ তুলতে কোন মোরগ নেই সেখানে। নিভৃত গুহার গভীর নৈঃশব্দ ভাঙ্গতে প্রহরারত কোন কুকুরের চিৎকার শোনা যাবে না এখানে। মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই এখানে। মানুষের কথা নির্বাসিত এখান থেকে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই এখানে —সবসময়েই রয়েছে এখানে একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। আলো, বাতাস, ঝড়ঝঞ্ঝার প্রবেশ-অধিকার নেই এখানে। এক নিষিদ্ধ পুরী

যেন সোমনুসের এই আবাসস্থল। প্রকৃতির শ্যামল আস্তরণ গুহার মুখের কাঁছ থেকে কিছুটা দূরে এসে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র লাল পপি, নিদ্রা-পুষ্প ফুটে আছে গুহার মুখে।

গুহার মাঝখানে কালো পালকের আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে নিদ্রা-দেবতা সোমনুস। তাঁর আশেপাশে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানন স্বপ্ন, সুস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন আর রাতের আতঙ্ক তার চারিদিকে বেষ্টন করে আছে।

গুহার এক কোণে রাখা লণ্ঠন নিয়ে ইরিস সোমনুসের আরাম-কেদারার কাছে এল, যারা তাকে ঘিরে রেখেছিল সেই স্বপ্ন, আতঙ্ক দূরে চলে গেল। সোমনুসকে ডাকলেন ইরিস বারকতক। আরাম-কেদারার ওপর আধো-ঘুমন্ত, আধো-জাগা অবস্থায় সোমনুস ইরিসকে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই তার। ইরিস তার কাছে সিক্স্ আর হ্যালসিয়নের প্রসঙ্গ তুলে বললেন তিনি যদি সিক্স্-এর আত্মাকে হ্যালসিয়নের কাছে পাঠান তার নিজেরই মৃত্যুর খবর দিতে, তাহলে দেবী জুনো বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবেন তাঁর কাছে। সোমনুস ঘুম-জড়ানো চোখে বললেন, 'তাই হবে।'

সেই রাতেই হ্যালসিয়নের ঘরে অশরীরি আত্মার আবির্ভাব হয়। সিক্স্-এর আত্মা তাঁর সামনে এসে তাঁকে জানাল যে সিক্স্ জাহাজ-ডুবিতে মারা গিয়েছেন। হ্যালসিয়নকে একথা জানিয়েই সিক্সের আত্মা অদৃশ্য হয়ে যায়। হ্যালসিয়ন তখন জুনোর কাছে প্রার্থনা জানালেন, তাঁর স্বামীর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে তিনি যেন তাঁকে সাহায্য করেন।

হ্যালসিয়ন সমুদ্র-তীরে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন তাঁর স্বামীর মৃতদেহকে। কখনও সমুদ্র-ঘেঁষে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে জল ভেঙ্গে চলেছেন, কখনও সমুদ্রের পাড়ে সার সার পাথরের চাঙ্গড়ের ওপর দিয়ে চলেছেন স্বামীর মৃতদেহের সন্ধানে। তাঁর দুঃখে সমুদ্রের কোন ভাবান্তর নেই। সমুদ্রের সুনীল জলরাশি দুগ্ধ-ফেনিল ঢেউ তুলে অবিরাম দুরন্ত গতিতে গড়িয়ে এসে সজোরে আছড়ে

পড়ছে উপকূল বরাবর; সমুদ্র তার নিজের ভাঙ্গাগড়ার কাজেই মগ্ন—তার কাছে হ্যালসিয়নের স্বামীর মৃত্যু কোন ঘটনাই নয়—কতশত মানুষ, জলযান তার গর্ভে লীন হয়ে যায়—সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার—আপন মনে সে অবিশ্রাম গুরুগম্ভীর গর্জন তুলে ছন্দোময় জলোচ্ছ্বাসের আবর্ত সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে কালের বুকে।

শেষে একদিন এক উঁচু পাথরের টিলার ওপর থেকে স্বামীর মৃতদেহটি জলে দেখতে পেলেন হ্যালসিয়ন। তখন যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার মুহূর্তে হ্যালসিয়ন সেই উঁচু পাথরের টিলার ওপর থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্ম-বিসর্জন দিলেন স্বামীর সহগামী হওয়ার জন্য। মুহূর্ত-পরে হ্যালসিয়ন একটি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে সমুদ্রের উপর উঠে গিয়ে পাক খেতে খেতে বুকভরা ভালবাসার গান গাইতে লাগল সকরুণ সুরে—বেদনাবিধুর কণ্ঠস্বর তার। দেবী জুনোরই লীলা-খেলা এসব। সিক্স্‌কেও তিনি পাখিতে পরিণত করে দেন। সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত এই দুটি দেহই পাখিতে রূপান্তরিত হয়—প্রেম-প্রীতির শাশ্বত রূপ সমুদ্রের উপর ঐ দুটি পাখিকে কেন্দ্র করে হল উদ্ভাসিত—দুজনে সমুদ্রের উপর মহা-আনন্দে ঘুরপাক খায় অসীম প্রাণোচ্ছ্বাসে—প্রণয় ভালবাসার গান গেয়ে আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলে উড়ে চলে দুজনে পাশাপাশি। এরাই হল মাছরাঙা।

শীতের সাতদিন আগে ও সাতদিন পরে জুপিটার সমুদ্রে বাতাসের দাপট বন্ধ করে দেন। এই সময়েই হ্যালসিয়ন তার বাসায় ডিমে তা' দেয় আর নাবিকেরাও তখন বুঝতে পারে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া এই সময়টাতেই নিরাপদ। ঐ দিনগুলোই হল শান্তি আর আনন্দে ভরা 'হ্যালসিয়ন দিন'।

সিরেসের দুঃখ ও আনন্দ

পৃথিবীতে গাছ-পালা উদ্ভিদ সৃষ্টির মূলে ছিলেন দেবী সিরেস—উদ্ভিদ ও শস্যের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীসের এই দেবীর মহিমায় ধরিত্রী শস্য-শ্যামল হয়ে উঠত। তাঁর ইঙ্গিতেই সূর্যালোকে প্রাণের সাড়া পড়ে যেত—তাঁর ইচ্ছায়ই পৃথিবী প্রাণ পেত বৃষ্টিধারায়—সূর্যের কিরণছটায় আর বারিধারায়ই তো বৃক্ষ-উদ্ভিদ-লতাগুল্মের জীবন-ধারণ—প্রকৃতির অস্তিত্ব।

সিরেসকে কিন্তু সহ্য করতে পারতেন না গ্রীসের অপর এক দেবী ভেনাস। ভেনাস ছিলেন ভালবাসা ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সিরেসের ক্ষতিসাধনের জন্য ভেনাস বেশ কিছুদিন ধরে পরিকল্পনা ভাঁজছিলেন। একদিন এক পাহাড়ের কোলে ঘন সবুজ প্রান্তরের ওপর বসে আছেন তিনি, পাশে তীর-ধনুক নিয়ে খেলা করছিল তার ছোট ছেলে কিউপিড। অনতিদূরে সিরেসের সুন্দরী কন্যা প্রসের-পাইন আপন মনে ফল পাড়ছিল গাছ থেকে। পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্লুটো সেই সময় সেখান দিয়ে মন্থরবেগে যুদ্ধ-রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। ভেনাসের চোখে পড়ে গেল প্লুটোর রথ। প্লুটোকে
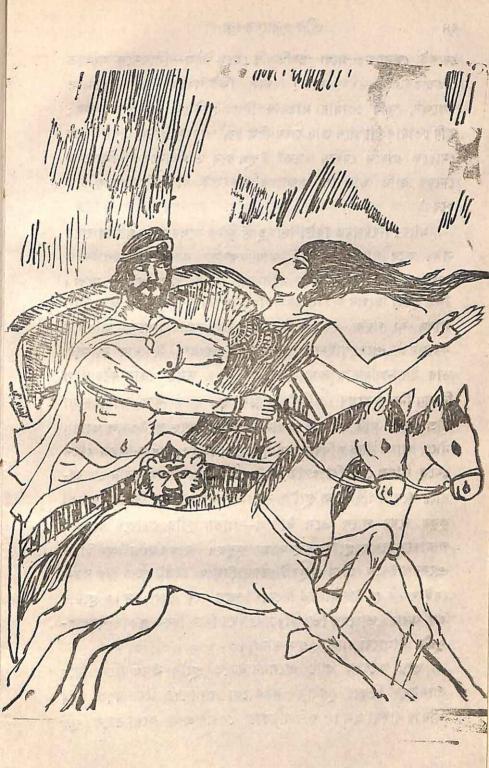
দেখেই ভেনাসের মধ্যে দুরভিসন্ধি জেগে উঠল—সিরেসকে আঘাত দেওয়ার এই তো সুযোগ! ছেলে কিউপিডকে ডেকে ভেনাস বললেন, 'তুমি তোমার যাদুবাণ দিয়ে প্লুটোকে এখনই বিদ্ধ কর; যদি তোমার যাদুবাণে তার হৃদয় বিদ্ধ হয়, তাহলে প্লুটো এখানে যে মেয়েকে প্রথমে দেখবে তাকেই উন্মুখ হবে ভালবাসতে। সিরেসের মেয়ের প্রতি ভালবাসা সঞ্চারের জন্য এই বাণ তোমাকে ছুঁড়তে হবে।'

মায়ের নির্দেশমত কিউপিড মুহূর্তে ছুটন্ত রথের মধ্যে প্লুটোর হৃদয় লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন। বাণ লক্ষ্যভেদ করল—প্রসেরপাইনকে দেখামাত্র তার প্রতি নিবিড় ভালবাসা জেগে উঠল প্লুটোর মধ্যে। কিন্তু প্লুটো ছিলেন অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির দেবতা এবং যা কিছু তার ভাল লাগত বা পছন্দ হত তাই ছলে-বলে-কলা-কৌশলে অধিকার করতেন। প্রসেরপাইনকে কোনরকম অনুরোধ উপরোধ না করে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা গ্রাহ্য না করে তাকে জোর করে তুলে নিলেন নিজের রথে। পৃথিবীর মাটির স্তর ভেদ করে লাগামছাড়া তীব্র দুরন্ত গতিতে কোন্ অজানা অন্ধকার জগতে ছুটে চলল তারা। নীচে, আরও নীচে পৃথিবীর গভীর অতলে নিকষ আঁধার-জগতে নেমে যেতে লাগল সেই বিদ্যুৎগতি রথ। অবশেষে পাতাল পুরীর তোরণ-দ্বারে এসে উপস্থিত হল প্লুটোর রথ। তিনমুখো এক বিশাল কালো কুকুর রথের পাশে এসে দাঁড়াল—পাতালপুরীর তোরণে অহর্নিশ পাহারায় রয়েছে প্লুটোর এই ভয়ঙ্কর কুকুর। রথের মধ্যে অপরিচিত প্রসেরপাইনকে দেখে কুকুরটি তার ত্রিমুখে বিকট গর্জন শুরু করল যেই অমনি প্লুটোর ইঙ্গিতে নিমেষেই শান্ত হয়ে গেল সে। প্লুটোর রথ এবার তোরণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে চির-অন্ধকার পাতাল-পুরীর প্রাসাদের সামনে এসে থামল।

ভয়ে অচৈতন্য প্রায় প্রসেনপাইনকে প্লুটো কাঁধে তুলে নিয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকল। জমকালো প্রাসাদের এক কক্ষে তার থাকার ব্যবস্থা হল। পরিচারিকারা সেবাসুশ্রুষা করে তাকে সুস্থ

করে তুলল। তারপর সেই জমকালো প্রাসাদে মহল্লার পর মহল্লা ঘুরিয়ে দেখিয়ে প্লুটো বলল তাকে, সে যদি তাকে ভালবাসে তাহলে এই ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য সবকিছুই তার হবে। কিন্তু কোন কিছুতেই প্রসেনপাইনের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

প্রসেরপাইনের এই অবস্থা দেখে কিছুটা সহানুভূতি এল প্লুটোর মনে। পরিচারিকাদের আদেশ দিল প্রসেরপাইনের জন্য সর্বোত্তম খাবারের ব্যবস্থা করতে। পরিচারিকারা প্রসেরপাইনের ঘরে টেবিলের ওপর থরে থরে খাবার নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখল, কিন্তু প্রসেরপাইন খাবারের দিকে নজরই দিল না। সে কেবলই কেঁদে চলেছে, কান্না তার কেউই থামাতে পারে না।

এদিকে সিরেস অনেকক্ষণ মেয়েকে দেখতে না পেয়ে পাহাড়ের কোলে সেই সবুজ প্রান্তরে এসে হাজির হল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোথাও চিহ্ন পেল না মেয়ের। মেয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল কত—সেই বুকফাটা আওয়াজ আকাশে বাতাসে অনুরণন জাগাল কিন্তু কোন সাড়া এল না কোনো দিক থেকে। সারা দিন, সারা রাত তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন সিরেস তাঁর মেয়েকে। চারিদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি, কারোর সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করেন—পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েও মেয়ের সন্ধান পেলেন না সিরেস।

একদিন এক দীঘির পাড়ে বিশ্রাম করছিলেন সিরেস। এমন সময় গুটি গুটি পায়ে ছোট একটি মেয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েটি সিরেসের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন তুমি এত মনমরা হয়ে পড়েছ? এস না আমাদের বাড়ীতে। মা তোমাকে কেক খাওয়াবে।'

ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে সিরেসের মন বিচলিত হয়ে উঠল, নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল তার।—এমনই তো ছোট্টটি ছিল তার প্রসেরপাইন! মেয়েটির কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত সিরেস তার সঙ্গে তার বাড়ীতে গেল।

মেয়েটির বাড়ীতে একটা থমথমে পরিবেশ লক্ষ্য করলেন সিরেস। দেখলেন ছোট্ট মেয়েটির দাদা ভীষণ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। মেয়েটির বাবা-মা চিন্তিত, বিমর্ষ। ছেলেকে সুস্থ করার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না তারা। সিরেস নিজে উদ্ভিদ-লতা-গুল্মের দেবী, সুতরাং কোন্ গাছের শিকড়ে বা কোন্ লতাপাতার রসে কি রোগ সারে তা তার নখদর্পণে। তিনি মুহূর্ত-মধ্যে ওষধিলতা সংগ্রহ করে এনে তা বেটে খাইয়ে দিলেন ছেলেটিকে। অব্যর্থ ফল। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠল। ছেলেটির বাবা-মার আনন্দ ধরে না। সিরেসরও আনন্দ হল, কিন্তু বুকের ভিতরটা তার জ্বলে যাচ্ছিল নিখোঁজ মেয়ের জন্য। সিরেসের মন এমনই ভারাক্রান্ত ছিল যে পৃথিবীর প্রতি নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতেই ভুলে গেলেন তিনি। তিনি নিক্রিয় থাকায় সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হল পৃথিবী ; মুছে গেল মেঘের চিহ্ন আকাশে, বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হল পৃথিবী। নীরস অনুর্বর হয়ে গেল পৃথিবীর মাটি—শস্যক্ষেত সব মরামাঠে পরিণত হল, নিস্ফলা নিষ্পত্র গাছগাছালি। পৃথিবীর মানুষের দিন কাটে অর্ধাহারে, অনাহারে।

পৃথিবীর এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে দেবতারা প্রমাদ গুণলেন। বুঝলেন তাঁরা এখুনি একটা কিছু না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু তাঁরা ভেনাস আর প্লুটোর ভয়ে সিরেসকে কিছুই বলতে পারছিলেন না—সিরেসের মেয়ের হদিস জেনেও বলতে পারছিলেন না তারা সিরেসকে যে, মেয়ে তাঁর প্লুটোর কাছে বন্দী। শেষে উপাবন্তর না দেখে সিরেসকে তাঁরা জানালেন যে দুষ্ট প্লুটো তাঁর মেয়েকে পৃথিবীর অতলে অন্ধকার জগতে নিয়ে গিয়েছে। সিরেস একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ জুপিটারের শরণাপন্ন হলেন। জুপিটার যদিও দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ছিলেন, কিন্তু প্লুটোর যাদুশক্তি বা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার জন্য সমীহ করতেন তাকে। সিরেসকে বললেন তিনি, 'যদি প্রসেরপাইন প্লুটোর প্রাসাদে কোন খাবার স্পর্শ না করে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব

কিন্তু প্লুটোর কাছ থেকে সে যদি এক কণা খাবারও খায়, তবে তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হবে। সিরেসের অনুরোধেই জুপিটার তাঁর ছেলে মরেকারিকে দূত হিসাবে পাতালপুরীতে পাঠালেন প্রসের-পাইনকে প্লুটোর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

মারকারি তার ডানায় ভর দিয়ে বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে পাতালের অন্ধকার পুরীতে চলে গেলেন নিমেষে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে তার দৌত্য সফল হল না অল্পের জন্য। প্লুটোর প্রাসাদে মারকারির পৌঁছানোর কয়েক মুহূর্ত আগে প্লুটোর একান্ত পীড়া-পিড়িতে প্রসেরপাইন একটি বেদনার পাঁচটি বিচির রস খেয়ে ফেলেছিল। মাসের পর মাস প্রসেরপাইন প্লুটোর প্রাসাদে এক কণা খাবারও স্পর্শ করে নি। কিন্তু কি হল আজ প্রসেরপাইনের, প্লুটোর অনুনয়-বিনয়ে মুহূর্তের দুর্বলতায় একটি বেদনার ছ'টি বিচির রস খেয়ে ফেলল সে। এরই পরিণামে প্রসেরপাইন নিজের অজান্তে প্লুটোর কাছে বাঁধা পড়ে গেল। প্লুটো এখন তার যাদুগুণে নিশ্চিত হল যে প্রসেরপাইন যেখানেই যাক বা তাকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক, ছয় মাস অর্থাৎ বছরের অর্ধেক সময় তাকে থাকতে হবে তার কাছে।

মারকারি অন্ধকার-পাতালপুরীতে এসে প্লুটোকে বললেন প্রসেরপাইনকে ফিরিয়ে দিতে। মেয়ের জন্য সিরেসের মনোকষ্টের কথাও জানাল মারকারি। কিন্তু প্লুটো নির্দয়ভাবে বলল, প্রসের-পাইনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না সে, পাতালপুরীতে থাকতে হবে তাকে। মারকারি তখন প্লুটোকে জানালেন পৃথিবীর মানুষেরা অনাহারে মারা যাচ্ছে। কন্যার অন্তর্ধানে মর্মাহত সিরেসের উদাসীনতায় পৃথিবী আলো জল থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে, মৃতপুরী হতে চলেছে পৃথিবী, কিন্তু তাতেও প্লুটোর মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির সঞ্চার হল না। উপরন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'পৃথিবীতে খাদ্য নেই, আলো নেই, জল নেই, তার জন্য তো আমি দায়ী নই। সিরেসই দায়ী সিরেসের কাছে যাও। তখন মারকারি বললেন, দেবরাজ

জুপিটার তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রসেরপাইনকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে। মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েও দেবরাজের প্রতি তার মনোভাব মারকারির কাছে প্রকাশ করল না প্লুটো। দেবরাজের অভিপ্রেত মত প্রসেরপাইনকে মারকারির সঙ্গে পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে। যাতুকর প্লুটো তো জানেই প্রসেরপাইনকে বছরে ছয় মাসের জন্য তার কাছে থাকতেই হবে।

মারকারি প্রসেরপাইনকে পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে সিরেসের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে জুপিটারের নির্দেশ পালন করলেন। সিরেস মেয়েকে পেয়ে মহা-আনন্দে সৃষ্টি রক্ষার কাজ শুরু করে দিলেন আবার।

পৃথিবীতে গাছপালা উদ্ভিদে নতুন প্রাণ ফিরে এল—ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলল—মানুষের ঘরে ঘরে শস্যভাণ্ডার পূর্ণ হল—আবার আনন্দে ভরপুর হল মানুষের জীবন। এমনি করেই কাটল ছয় মাস।

ছ'মাস পরে সিরেস আর প্রসেরপাইনকে তার কাছে রাখতে পারলেন না। প্লুটোর দেওয়া বেদনার ছ'টি বিচির রস খাওয়ার ফলে প্রসেরপাইনকে বাকি ছ'মাস ভাগ্যচক্রে প্লুটোর কাছেই থাকতে হবে। তাই ছ'মাস মায়ের কাছে থাকার পরই সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে প্রসেরপাইন অলঙ্ঘ্য নিয়মে মাকে ছেড়ে পাতালপুরীতে চলে গেল প্লুটোর কাছে। কন্যাকে আবার হারিয়ে সিরেস মনের আনন্দ হারিয়ে ফেললেন, দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। মেয়েকে ছাড়া কিছুই আর তিনি চিন্তা করতে রারছেন না। পৃথিবীতে শস্যের উৎপাদনের কথা তিনি ভুলেই গেলেন, উদ্ভিদ-জগতের চিন্তা তার মাথাতেই থাকল না। তার উদাসী মনের জন্য সূর্যও স্বাভাবিক তাপ দিতে সমর্থ হল না। ক্ষেতে মাঠে প্রান্তরে এল সর্বগ্রাসী রুক্ষতা—বাদামী ছোপ পড়ল ঘাসে ঘাসে, গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়তে লাগল, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়তে শুরু করল। এই তো শীতকাল।

যখন প্রসেরপাইন তার মায়ের সঙ্গে ছ'মাস থাকে পৃথিবীতে, তখন আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় পৃথিবীতে; বছরের বাকি ছ'মাসের

জন্য প্লুটো যখন প্রসেরপাইনকে পাতালপুরীতে নিয়ে যায় তখন সিরেসের দুঃখে পৃথিবী নিরানন্দ হয়ে যায়, প্রকৃতিতে এক জড়ভাব অসে তখন—এই সময়টাই শীতকাল।

শীত গ্রীষ্ম—গ্রীষ্ম, শীত—ঋতু পরিবর্তন হয় অমোঘ নিয়মে সিরেস ও তাঁর কন্যা প্রসেরপাইনের সুখ-দুঃখের আবর্তনে।

ইউলিসিস ও সাইক্লোপস্

ট্রয়ের যুদ্ধশেষে গ্রীক সেনাপতি ইউলিসিস সমুদ্রপথে তাঁর দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। সমুদ্র-পথে নিরুপদ্রবেই তাদের জাহাজ চলছিল। মাঝপথে আকস্মিক কালো মেঘে ছেয়ে গেল চারিদিক, তারপরে শুরু হল ঝড়ের দাপট—সমুদ্রে সে কি ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাস—দুরন্ত ঝড় আর মত্ত ঢেউয়ের আক্রমণ বুঝি আর সহ্য করতে পারে না তাদের জাহাজ। দিকহারা হয়ে সমুদ্রে এলোমেলো ভেসে বেড়াতে লাগল তাদের জাহাজ। নির্দিষ্ট পথ থেকে বহুদূরে কোথায় যে ভেসে চলল জাহাজ, নাবিকেরা ঠাহর করতে পারল না। কয়েকদিন এইভাবে জাহাজ ভেসে চলল, ইতিমধ্যে জাহাজে রাখা মজুত খাবার আর পানীয় জল ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে এল। কোনোভাবে জাহাজটাকে যদি পাড়ে না ভেড়ানো যায় তাহলে অনাহারে মরতে হবে জাহাজের ভিতরে সকলকে, কিন্তু ইউলিসিস দেখলেন, সেটাও সম্ভব না, কেননা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে নাবিকেরা। তিনদিন পর আশার আলো দেখতে পেলেন ইউলিসিস ও তাঁর লোকেরা, যখন লক্ষ্য করলেন তাঁরা জাহাজটা

ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় পাড়ের দিকে এগোচ্ছে। কোন্ দেশে জাহাজটি ভিড়ছে কেউই বুঝতে পারল না।

ইউলিসিস জায়গাটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে আন্দাজ করে নিলেন যে এটা সাইক্লোপ্‌স্‌-এর দেশ হতে পারে—সাইক্লোপ্‌স্‌-এর দেশের সম্পর্কে যে তথ্য তাঁর জানা ছিল তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁর এই ধারণা হল। সাইক্লোপ্‌স্‌ একশ্রেণীর ভয়ঙ্কর দৈত্য—কপালের মাঝখানে এক রক্তলাল চোখ তাদের।

ইউলিসিস প্রথমটা ইতস্তত করছিলেন লোকজনদের নিয়ে ডাঙ্গায় নামতে। কিন্তু খাবার আর জলের জন্য তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, ইউলিসিস চিন্তা করলেন, জাহাজে থাকলে খাবারের অভাবে তাদের মরতে হবে আবার ডাঙ্গায় নামলে দৈত্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে—ত্রিশঙ্কু অবস্থা তাঁদের। শেষে তিনি চূড়ান্তভাবে স্থির করলেন ডাঙ্গায় নামবেন। জাহাজ থেকে দূরে দেখা গেল একটি পাহাড় আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইউলিসিস দেখলেন, পাহাড়ের কোলে এক বিরাট গুহার মুখ। তিনি জানতেন এই জাতীয় গুহাতেই সাইক্লোপ্‌স্‌রা থাকে। খাবার সংগ্রহ করতে হলে সাইক্লোপ্‌স্‌দের আস্তানাতে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, বুঝলেন তা। সাইক্লোপসদের সঙ্গে যদি কোনোভাবে বন্ধুত্ব করা যায় তাহলে খাবার পেতে অসুবিধা হবে না, ভাবলেন ইউলিসিস। আর সাইক্লোপ্‌স্‌রা যদি শত্রুভাবাপন্ন হয় তাহলে ইউলিসিস অন্য ব্যবস্থা নেবেন ঠিক করলেন। ইউলিসিস গুহার মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ করলেন না।

তিনি তার দলের লোকজনদের মধ্যে থেকে বারজন লোককে বাছাই করে নিলেন এবং তাদের নিয়ে ইউলিসিস তীরে নেমে কিছুটা হেঁটেই সেই গুহায় ঢুকলেন, মদভর্তি একটা বিরাট চামড়ার থলি ছিল তাঁদের সঙ্গে।

গুহায় ঢুকে দেখলেন তাঁরা, গুহাটির আয়তন যে রকম মনে হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় এই গুহা। বহু বসতবাড়ী

এর মধ্যে তৈরি করা যায়। ভিতরে, একটি নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় শ'য়ে শ'য়ে ভেড়া আর ছাগলের থাকার ব্যবস্থা। গুহার মধ্যে একদিকে পনের-কুড়ি হাত জায়গা জুড়ে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে, ফলে অন্ধকার গুহার একদিকটা আলোকিত হয়ে আছে। ইউলিসিস তাঁর সাথীদের নিয়ে সেই বিরাট লম্বা চওড়া গুহার অন্ধকার এক জায়গায় দেয়ালে পিঠ দিয়ে চুপিসাড়ে বসে পড়লেন। ইউলিসিস স্থির করেছিলেন মদ উপঢৌকন দিয়ে সাইক্লোপ্‌স্‌-এর কাছ থেকে কিছু ভেড়া আর ছাগল নেবেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তাঁদের। এক দঙ্গল ভেড়া আর ছাগলের চিৎকার শুনতে পেলেন তাঁরা, সার বেঁধে গুহায় ঢুকে পড়ল সেই ছাগল আর ভেড়ার পাল। তাদের পিছন পিছন এসে ঢুকল এক বিরাটাকার দৈত্য—কপালের মাঝখানে তার চোখ—এই ভয়ঙ্কর-দর্শন দৈত্যটিই যে সাইক্লোপ্‌স্‌ এটা সহজেই বুঝল ইউলিসিস আর তাঁর লোকেরা। খানকতক বিরাট বিরাট গাছের গুড়ি সাইক্লোপ্‌স্‌ কাঁধ থেকে নামিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। কি ভয়ানক শক্তিশালী এই দৈত্য—অনায়াসে এত বড় বড় গাছের গুড়ি একসঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে দূর দূর জায়গা থেকে। আগুনের মধ্যে গুড়িগুলোকে ফেলেই সাইক্লোপস্‌ গুহার দরজা এক বিরাট পাথরের চাঙড় দিয়ে বন্ধ করে দিল। গুহাটি ঘোর অন্ধকার নরকপুরী হয়ে যেত, যদি না গুহার মধ্যে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা থাকত। আগুনের আলোয় সাইক্লোপস্‌-এর দৃষ্টি এবার ইউলিসিস আর তাঁর লোকদের উপরে পড়ল।

তাদের দেখেই সাইক্লোপস্‌ প্রচণ্ড গর্জন করে বলল, 'জান আমি সাইক্লোপস্‌। তোমরা কে?'

সাইক্লোপস্‌কে দেখেই ইউলিসিস এবং তাঁর লোকেরা ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল—ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে যেত তারা সেখান থেকে—গুহার দরজায় পাথর চাপা না থাকলে।

উপায়ন্তর না দেখে ইউলিসিস উত্তর দিলেন, আমরা ট্রয়ের যুদ্ধ

জয় করে দেশে ফিরে চলেছি। কিন্তু ঝড়ে পথ হারিয়ে আমরা এই দ্বীপে এসে পড়েছি। দীর্ঘ দিন জলে থাকায় আমাদের জাহাজে মজুত করা খাবার ও জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা তোমার জন্য প্রচুর মদ এনেছি, তার বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কিছু খাবার চাই, গোটাকতক ছাগল ভেড়া যদি তুমি আমাদের দাও, তাহলে আবার আমরা সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারব।'

ইউলিসিসের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ইউলিসিসের দুজন লোককে খপ করে তুলে নিয়ে কয়েকটা কামড়েই খেয়ে নিল সাইক্লোপস্‌—মুরগীর ছানা খেল যেন সে। রাগে উত্তেজনায় ইউলিসিস ফেটে পড়তে লাগলেন—কিন্তু অসহায় তিনি, লোক দুটোকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না সাইক্লোপস্‌-এর হাত থেকে। সাইক্লোপস্‌ এবার ভেড়াদের মাঝখানে প্রশস্ত জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইউলিসিস এবং তাঁর লোকেরা হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যে পড়লেন। সাইক্লোপস্‌-এর সঙ্গে লড়াই করা বা তাকে মেরে ফেলা তাঁদের সাধ্যের বাহিরে। অত বিশাল একটা দৈত্যের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটা মানুষ কিভাবে বুঝবে? তাছাড়া সাধারণ কয়েকটা ছুরি ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও কিছু নেই তাদের কাছে। আবার তাঁরা যদি সাইক্লোপস্‌কে কোনোভাবে মেরেও ফেলে, গুহার বাইরে বেরোবে কি করে? গুহার মুখ যে সাইক্লোপস্‌ বিরাট একটা পাথরের চাঙড় দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। সেই পাথরের চাঙড় টেনে সরাতে অন্তত পঞ্চাশটি ঘোড়ার দরকার।

পরের দিন সকালবেলায় সাইক্লোপস্‌-এর ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকেই উঠেই সে ইউলিসিসের আরও দুজন লোককে ধরে নিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিল। ভূরিভোজের পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই সাইক্লোপস্‌ গুহার মুখের পাথরটা সরিয়ে বাইরে গিয়ে পাথরটা আবার চাপা দিয়ে গুহা ছেড়ে চলে গেল।

ইউলিসিস আর তাঁর লোকেরা বুঝলেন, তাঁরা গুহায় এখন বন্দী

হয়ে আছেন, পালাবার কোন পথ নেই। প্রচণ্ড ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করছিলেন তাঁরা—সুযোগ পেয়ে এবারে তাঁরা সাইক্লোপস্-এর ভেড়ার পাল থেকে একটাকে ধরে আগুনে ঝলসিয়ে নিলেন। খাওয়াদাওয়া সারার পর ইউলিসিস তাঁর লোকজনদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে— কিভাবে গুহার বাইরে যাওয়া যাবে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ইউলিসিস একটা পথ বাতলালেন। যেসব গাছের গুড়িগুলোকে সাইক্লোপস্ গুহায় নিয়ে এসেছিল আগুন জ্বালাবার জন্য তাদের মধ্যে কয়েকটা গুড়ি অক্ষত ছিল। একটা গুড়ি বেছে নিয়ে তার মুখটা ছুরি দিয়ে ছুঁচোলো করে কাটলেন তাঁরা এবং সেটিকে গুহার একপাশে রেখে দিলেন। দিনের বেলায়ই কাজটি সেরে ফেললেন তাঁরা।

রাত্রিতে ফিরে সাইক্লোপ্স্ পাথর সরিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকল, তার পেছনে পেছনে ছাগল আর ভেড়ার দলও ঢুকল। এবার সাই-ক্লোপ্স্ গুহার মুখ ভিতর থেকে আবার পাথর চাপা দিল।

ইউলিসিস আগে থেকেই বুঝেছিলেন রাতের খাবারের জন্য সাইক্লোপ্স্ তাঁর আরও দুজন লোককে ধরবে। তাই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সাইক্লোপসকে দেখামাত্রই একটা মদের পাত্র তাকে দেখিয়ে ইউলিসিস বললেন, 'সাইক্লোপ্স্ তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি আমি।' চামড়ার থলিটি দেখিয়ে ইউলিসিস বললেন তাকে, এই মদ তাদের দেশের সেরা পানীয়, এর থেকে উৎকৃষ্ট পানীয় আর কিছুই নেই। 'পাত্রে খেতে হবে না তোমাকে। চামড়ার থলিটাই তোমাকে দিচ্ছি। এর মুখ খুলে দিলাম, তোমার কাছে এই থলিভর্তি মদও যৎসামান্য। তবুও তোমাকে এই সামান্য উপহার দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। খাওয়ার আগে এই পানীয় খেলে তোমার ক্ষিদেও বাড়বে। শরীরটাও চাঙ্গা হবে। অঢেল খাবার খাওয়ার ক্ষমতাও হবে তোমার।'

চামড়ার থলিটি না নিয়ে প্রথমে মদের পাত্রটি থেকেই মদ খেয়ে দেখতে গেল সাইক্লোপ্স্ কিরকম স্বাদ এই মদের। এক চুমুকে

সবটা খেয়েই বেশ মজা লেগে গেল সাইক্লোপ্‌স্‌-এর। সঙ্গে সঙ্গে ইউলিসিসের হাত থেকে মদের থলিটি নিয়ে ঢোক ঢোক করে সবটা মদ গিলে ফিলল সাইক্লোপ্‌স্‌। এর পরেই সাইক্লোপ্‌স্‌-এর মাথা টলতে লাগল। শরীরকে নিস্তেজ ও ঘুমকাতর করার জন্য কিছু ওষধিলতার রস মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল ইউলিসিস এই মদের সঙ্গে। নেশার ঘোরে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে সাইক্লোপ্‌স্‌। মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল তার। তারপর সে সর্ব-অঙ্গ ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে, চোখ তার জ্বালা করে টানতে লাগল। জড়ানো চোখে সে ইউলিসিসকে উদ্দেশ করে বলল, 'অনেক পানীয় খেয়েছি আমি, কিন্তু এরকম পানীয় আমি জীবনে খাই নি।' চোখ বুজে বিরাট একটা হাই তুলে বলল, 'তোমার নামটা কি যেন।'

ইউলিসিস বললেন, তাঁর নাম 'অমানুষ'।

'অমানুষ, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।' কথা বলতে গলা জড়িয়ে আসছিল সাইক্লোপ্‌স্‌-এর। 'তোমার এই উপহারের জন্য তোমাকে একটি অনুগ্রহ দেখাব। তোমার লোকজনদের একে একে খেয়ে শেষে তোমাকে খাব।' এই কথা বলেই প্রচণ্ড শব্দে নাক ঘর্ঘর করতে লাগল সাইক্লোপ্‌স্‌—গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল সাইক্লোপ্‌স্‌।

এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন ইউলিসিস। তিনি আর তাঁর সাথীরা একদিক ছুঁচোলো সেই গাছের গুড়িটাকে তুলে সাইক্লোপ্‌স্‌-এর বুকের ওপর সোজাসুজি তুলে ধরল। তারপরে গুড়িটির সেই ছুঁচোলো দিকটা সাইক্লোপ্‌স্‌-এর চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কপালের ওপর তার একটাই চোখ—সাইক্লোপ্‌স্‌-এর একমাত্র চোখটিই ছিন্নভিন্ন হয়ে বুজে গেল।

সাইক্লোপ্‌স্‌ প্রচণ্ড আর্তনাদ করে জেগে উঠল। গুড়িটাকে চোখ থেকে টেনে সরিয়ে সেটাকে নিয়ে যথেচ্ছ এলোমেলো ঘোরাতে লাগল গুহার ভিতরের লোকদের মেরে ফেলার জন্য। সাইক্লোপ্‌স্‌ অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার হাত থেকে এড়িয়ে গুহার মধ্যে নিরাপদ স্থানে

আশ্রয় নিতে কোন অসুবিধাই হল না ইউলিসিস আর তাঁর লোকেদের। সাইক্লোপ স্ চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যন্ত্রণায় উন্মত্ত হয়ে গিয়ে লাফাতে লাফাতে জ্বলন্ত গুড়ির ওপর পা মাড়িয়ে দিল ফলে যন্ত্রণা তার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। গলা চিড়ে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে গর্জন করতে লাগল সাইক্লোপ্‌স্। তার এই গগনভেদী গর্জনে অন্যান্য সাইক্লোপ্‌স্‌রা ছুটে এল তার গুহার মুখে। গুহার মুখে যে পাথরটি চাপা ছিল তাতে একটা ছোট্ট ফুটো ছিল। সেই ফুটো দিয়ে তার জাতভাই সাইক্লোপসরা চিৎকার করে জানতে চাইল, 'কেন সে এরকম গর্জন করছে? তাকে কি কেউ মেবেছে?

ভিতর থেকে অন্ধ সাইক্লোপ্‌স চিৎকার করে বলল, 'অমানুষ আমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে।'

বাইরের সাইক্লোপ্‌স্‌রা একথা শুনে বলল, 'অমানুষটা কে শুনি।'

'মানুষ, জন্তু, জানোয়ার দৈত্য কেউই আমাকে আঘাত করে নি। অমানুষই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।'

বাইরের সাইক্লোপ্‌স্‌রা ভাবল ঐ সাইক্লোপ্‌স্‌এর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে; অমানুষ বলে কোন প্রাণীই নেই—এটা উন্মাদের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। সাইক্লোপ্‌স্‌টিকে অযথা উত্তেজিত হতে তারা বারণ করল, তাকে শান্ত হয়ে থাকতে বলে চলে গেল তারা। ইউলিসিস আর তাঁর সাথীরা খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বাইরে সাইক্লোপ্‌স্‌দের আর সাড়া পাওয়া গেল না বলে। তাঁর বুদ্ধিতে কাজ দিয়েছে। সাইক্লোপ্‌স্‌কে বুদ্ধিবলে অন্ধ করে দিয়ে এবং নিজেকে অমানুষ বলে পরিচয় দিয়ে এযাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলেন ইউলিসিস ও তাঁর লোকজন। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি তাঁদের। সারারাত ধরে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে সেই দৈত্য সাইক্লোপ্‌স্ হুঙ্কার ছেড়ে গুড়িটাকে এলোমেলো ঘুরিয়ে যেখানে সেখানে বারি দিতে লাগল। ইউলিসিস আর তাঁর লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে করে গুহার মধ্যে জায়গা পালটিয়ে পালটিয়ে দৈত্যটার হাত থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখল। সকালবেলায় আন্দাজে আন্দাজে সাইক্লোপ্‌স্ গুহার দরজার কাছে

গেল। গুহার মুখে চাপা দেওয়া সেই বিরাট পাথরটাকে সে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। ভেড়া আর ছাগলগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্যই সে গুহার মুখটা খুলল। ইউলিসিস আর তার লোকজনেরা যাতে পালিয়ে না যায় সেজন্য সাইক্লোপ্‌স্ গুহার মুখে ভিতরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকল। ভেড়া আর ছাগলগুলো তখন গুহার মুখ খোলা পেয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। দৈত্যটি গুহার মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি ভেড়া আর ছাগলের গায়ে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিল। এটা করার উদ্দেশ্য, তার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে ইউলিসিস আর তার লোকজনেরা যাতে পালিয়ে না যায়।

গুহার ভেতরে দেয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে ইউলিসিস আর তার লোকজনেরা অন্ধ সাইক্লোপ্‌স্‌কে লক্ষ্য করছিলেন। সাইক্লোপ্‌স্ যেভাবে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি প্রাণীকে যাচাই করে নিচ্ছে, তাতে বুঝল তারা গুহা থেকে সহজে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। ইউলিসিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন, অন্ধ সাইক্লোপ্‌স্ প্রত্যেকটি ভেড়া ও ছাগলের পিঠে হাত বুলিয়ে বুঝে নিচ্ছে ইউলিসিস আর তার লোকজনেরা বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা। ইউলিসিস তার সাথীদের বললেন, তারা এক-একজন এক-একটি ভেড়ার পেটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে বসে তার পিঠটা হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ঝুলে থাকবে। এই উপায়ে ইউলিসিস আর তাঁর সাথীরা অন্ধ সাইক্লোপ্‌স্‌কে ফাঁকি দিয়ে গুহা থেকে পালিয়ে গেলেন।

গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁরা সামনে ছুটে যাওয়া সাইক্লোপস্-এর এক দঙ্গল ভেড়াকে তাড়া করে জাহাজে তুলে নিলেন। ইউলিসিস তাঁর সঙ্গিসাথীদের নিয়ে সাইক্লোপ্‌স্‌দের দেশকে চিরবিদায় জানিয়ে পাড়ি দিলেন জাহাজে দেশের উদ্দেশ্যে। সমুদ্রে এখন আর ঝড়ের চিহ্ন নেই, অনুকূল বাতাস তাদের জাহাজটাকে দেশে পৌঁছতে সহায়তা করল বরাবর।

হারকিউলিস

পৃথিবীর সৃষ্টির অল্প কিছুদিন পরই মহাশক্তিধর এক পুরুষের আবির্ভাব হয়। নাম তার হরেকিউলিস। হারকিউলিসের পিতা ছিলেন জুপিটার আর মাতা ছিলেন এই পৃথিবীর এক কন্যা। শৈশবেই হারকিউলিসকে দেখে বোঝা গিয়েছিল যে বড় হলে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অধিকারী হবে॥

একদিন শিশু হারকিউলিস এবং তার ভাই বিছানায় পাশাপাশি ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় দুটো বড় সাপ তাদের দিকে বুকে হেঁটে এগিয়ে এল চুপিসারে। হারকিউলিসের ভাইয়ের ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে যায়, সাপ দেখে চিৎকার করে ওঠে। এই চিৎকারে হারকিউলিসেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। সাপটিকে সামনে দেখতে পেয়েই সে তার গলাটাকে এমন শক্ত করে চেপে ধরে যে সাপটা দম বন্ধ হয়ে মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে।

হারকিউলিস বড় হল যখন, তার বিশালাকায় সুঠাম সবল চেহারা ও তার দুর্ধর্ষ সাহস ও শক্তির কথা রাজার কানে পৌঁছোল। একটি বিরাট সিংহ সেসময় চারিদিকে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করছিল। ক্ষিধে

পেলে সে কাউকেই বাদ দিত না, গরু ভেড়া মানুষ—যাকে পেত সামনে খেয়ে ফেলত তাকে। হারকিউলিসের দেশ মাইসিনের রাজা ইউরিথিয়াস দুষ্ট প্রকৃতির রাজা ছিলেন। হারকিউলিসের বিশালাকায় ঋজু দেহ ও তার বীরত্ব ও অসম সাহসিকতার জন্য ইউরিথিয়াস তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েন এবং তার ক্ষতিসাধনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। হারকিউলিসকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি তাকে সেই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সিংহটিকে বধ করার হুকুম দিলেন। বলতে গেলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে ফেলে দিলেন তাকে।

সিংহটির খোঁজে হারকিউলিস গভীর জঙ্গলে পাড়ি দিল। সিংহটির আশ্রয়ের সম্ভাব্য জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে সে খুঁজে বেড়াতে লাগল। একটা গাছের গুড়ি কেটে নিয়ে সেটাকে লগুড় হিসাবে হাতে রাখল সে। হঠাৎ জঙ্গলের এক জায়গায় সিংহটাকে দেখতে পেয়ে হারবিউলিস লগুড় নিয়ে তাড়া করল তাকে।

সিংহটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল একটা সামান্য মানুষকে তার সামনে এগিয়ে আসতে দেখে, হাতে মাত্র একটা লগুড় সম্বল করে। এটা সিংহের কাছে ভীষণ আশ্চর্যের মনে হল। হারকিউলিসকে দেখেই সে কাছেই এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। লগুড় ফেলে দিয়ে খালি হাতে হামাগুড়ি দিয়ে হারকিউলিস সিংহের পেছনে পেছনে ঢুকে পড়ল গুহার মধ্যে। সিংহটি গর্জন করে তার দিকে ফিরতেই হারকিউলিস তার গলা এক হাত দিয়ে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড জোরে টিপে ধরল—সাপটিকে যেভাবে সে মেরেছিল, ঠিক সেইভাবেই সিংহটিকেও মারল। সিংহটিকে এইভাবে মেরে হারকিউলিস তাকে নিয়ে রাজার কাছে গেল। বিশালদেহী সিংহটি দেখতে এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে মৃত অবস্থাতেও তাকে দেখে রাজা শিউরিয়ে উঠলেন। এই সিংহকে যে খালি হাতে মেরেছে কি পরিমাণ শক্তি যে তার দেহে আছে বুঝতে বাকি রইল না রাজার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর মধ্যে ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগল। হারকিউলিস মৃত সিংহটিকে নিয়ে গিয়ে তার চামড়া ছাড়িয়ে নিজের গায়ে জড়িয়ে

নিল। এই সিংহের চামড়াই হারকিউলিস সবসময়েই পরে থাকত। পরনে তার সিংহের চামড়া দেখেই লোক চিনতে পারত যে সে হারকিউলিস।

রাজা ইউরিথিয়াস আবার একদিন হারকিউলিসকে ডেকে পাঠিয়ে এক দুঃসাধ্য কাজের ভার দিলেন তাঁকে। সোনার শৃঙ্গ মাথায় এক হরিণকে ধরার ভার দিলেন তিনি হারকিউলিসকে। হরিণটি দৌড়াত প্রচণ্ড গতিতে। হারকিউলিস টানা এক বছর জঙ্গলে জঙ্গলে হরিণটার পিছনে ধাওয়া করে। অবশেষে ধরে ফেলে তাকে। দুর্লভ হরিণটাকে পেয়ে রাজার স্বর্ণসম্পদ বেড়ে গেল। মনে মনে খুশীই হলেন তিনি, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না হারকিউলিসের কাছে।

এরপর রাজা তাঁকে একদিন একটি ভীষণাকার দৈত্যকে মারতে পাঠালেন।

হারকিউলিস দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ছাখে, যতবারই তাকে সে মেরে মাটিতে ফেলে দেয় ততবারই দ্বিগুণ শক্তিতে সে লাফিয়ে ওঠে। হারকিউলিস যখন দেখল দৈত্যটাকে মাটিতে ফেলে মারা যাবে না, তখন সে দৈত্যটিকে শূন্যে তুলে নিয়ে ওর গলার টুঁটি চেপে ধরল দুই হাত দিয়ে সাঁড়াসির মত। দম বন্ধ হয়ে দৈত্যটা মারা গেল।

রাজার হুকুমে হারকিউলিস একটি ড্রাগনকে মারল। ছয় পা-যুক্ত অদ্ভুত আকৃতির এক দৈত্যকে নিধন করল। আরও অনেক দৈত্য-দানবকে নিধন করল।

এরপরে রাজা হারকিউলিসকে সবচেয়ে কঠিন কাজের ভার দিলেন। হারকিউলিসকে বললেন তিনি, 'বহুদূরে সমুদ্রের ওপারে এক মনোরম আপেলের বাগান আছে। সেই বাগানের অধীশ্বরী এক নারী নাম তার হেসপিরিদিজ্। ঐ বাগানে একটি গাছে সোনার আপেল ফলে। তুমি আমায় সেই গাছ থেকে তিনটি সোনার আপেল এনে দেবে। সোনার আপেল আনার জন্য ঐ বাগানে আজ পর্যন্ত যেই গিয়েছে তাকেই ড্রাগনের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে।

সোনার আপেল-গাছটির পাহারায় দিনরাত নিযুক্ত আছে ঐ ড্রাগন। আমার ধারণা, তুমি ঐ ড্রাগনকে মেরে ফেলে সোনার আপেল আনতে পারবে।'

হারকিউলিস রাজাকে বেশ আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বলল যে সে ড্রাগনকে মেরে রাজার অভিপ্রায় মত তিনটি সোনার আপেল তাঁকে এনে দেবে।

হেসপিরিদিসের বাগানের উদ্দেশে হারকিউলিস সেইদিনই রওনা হল। কোমরে জড়ানো সেই সিংহের চামড়া আর হাতে লগুড়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস হারকিউলিস হেঁটে চলল। শেষে এক নদীর পাড়ে এসে পড়ল সে। নদীর পাড়ে সারবন্দী ফুলগাছ থেকে কয়েকজন সুন্দরী মেয়েকে ফুল তুলতে দেখল হারকিউলিস। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হারকিউলিস সেখানে বসে পড়ল। মেয়েদের কাছে তার নাম বলল সে। হারকিউলিসের নাম তারাও শুনেছে বলল, তার দোর্দণ্ড শক্তির কথা জানে তারা। হারকিউলিসকে জিজ্ঞেস করল তারা, কোথায় যাচ্ছে সে। হারকিউলিস বলল, সে হেসপিরিদিসের বাগানে যাচ্ছে। 'আমি আমাদের রাজার জন্য তার বাগান থেকে তিনটি সোনার আপেল আনতে যাচ্ছি।'

মেয়ে তিনটি সেকথা শুনে আঁতকে উঠল। হারকিউলিসকে তারা অনুনয়-বিনয় করল যাতে সে না যায় সেখানে। হেসপিরিদিসের বাগানে গেলে নির্ঘাৎ হারকিউলিসের বিপদ ঘটবে এটা তারা জানত। তাই পই পই করে বারণ করল তারা হারকিউলিসকে সেখানে যেতে। তারা বলল হারকিউলিসকে, যারাই হেসপিরিদিসের বাগানে যায়, তাদেরই পাহারাদার ড্রাগনটি মেরে ফেলে।

হারকিউলিস তাদের বলল, 'আমি ড্রাগনের ভয়ে ভীত নই। কিন্তু আমার অসুবিধা হল একটাই, আমি হেসপিরিদিসের বাগানে যাওয়ায় সঠিক পথ জানি না। তোমরা কি আমাকে হেসপিরিদিসের বাগানে যাওয়ার সঠিক পথ বলে দেবে?'

মেয়েগুলো উত্তরে বলল, 'সমুদ্রের তীরে ঘুমন্ত ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে

জিজ্ঞেস কর। যখন তাকে সামনে পাবে, শক্ত করে ধরবে তাকে, নাহলে ও তোমাকে হেসপিরিদিসের বাগানের পথ দেখাবে না।'

সমুদ্র-তটে জলের পাশেই সেই বৃদ্ধ লোকটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখল হারকিউলিস। তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল হারকিউলিস। কিম্ভূতকিমাকার সেই বৃদ্ধের চেহারা। তার হাত আর পায়ের চামড়া মাছের আঁশের মত। সমুদ্রের উদ্ভিদ গজিয়ে উঠেছে তার মাথায়। হারকিউলিস লোকটির একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল।

হারকিউলিসের এই কাজে বৃদ্ধটির ঘুম ভেঙ্গে গেল যন্ত্রণায়। দেখল লোকটি, কে যেন তার একটা হাত জোর করে ধরে আছে, তার কাছ থেকে নিজের হাত-পা ছাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। নিজের চেহারাকে সে নানাভাবে পরিবর্তিত করতে পারত। নিজেকে সে হঠাৎ একটা শক্তসমর্থ হরিণে পরিণত করল—হরিণটা লাফ দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে হারকিউলিসের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর নিজেকে একটা পাখিতে পরিণত করল সে। উড়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু হারকিউলিসের হাত থেকে নিস্তার পেল না। তারপর সে নিজেকে একটা কুকুরে পরিণত করল; ছয় পা-যুক্ত অদ্ভুদদর্শন মানুষে পরিণত করল নিজেকে, শেষে বিরাট এক সাপের রূপ নিল। কিন্তু হারকিউলিস সাপটিকে শক্ত করে ধরে থাকল। অবশেষে বৃদ্ধ লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উপায়ন্তর না দেখে নিজের আসল চেহারায় ফিরে এল। তারপরেই সে চিৎকার করে বলল, 'তুমি কে? কি জন্য এখানে এসেছ তুমি? কি চাও তুমি?'

'আমি হারকিউলিস, হেসপিরিদিসের বাগানে কি করে যেতে হয় আমি জানি না। ঐ বাগানের যাওয়ার পথের সন্ধান চাই তোমার কাছে।'

বৃদ্ধ লোকটি হারকিউলিসের নাম শুনেছিল, তার দুর্বার সাহস আর দুর্জয় শক্তির কথা জানত সে। সুতরাং সে বুঝল হারকিউলিসের প্রশ্নের জবাব তাকে দিতেই হবে।

একটি নির্দিষ্ট দিকে হাত বাড়িয়ে লোকটি হারকিউলিসকে বলল, 'ঐ পথে যাও, যে পর্যন্ত না এ্যাটলাসের সাথে তোমার দেখা হয়। মহাদৈত্য এ্যাটলাস তার কাঁধের ওপর পৃথিবীর ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থিরভাবে। তাকে তুমি জিজ্ঞেস করলেই সে তোমাকে সব বলে দেবে।'

বৃদ্ধ লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে হারকিউলিস এ্যাটলাসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। গায়ে জড়ানো তার সিংহের চামড়া, হাতে লগুড় —হারকিউলিস হেঁটে চলেছে অবিরাম। শেষে এক বিরাট লম্বা চওড়া দীঘির সামনে এসে পড়ল সে।

দীঘির দু'পাড়ে দুটি বিরাটাকার পায়ের পাতা স্থির রয়েছে দেখতে পেল হারকিউলিস। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল পা দুটো তার আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। হারকিউলিস ভেবে কূল পেল না কিভাবে সে শূন্যে অত উঁচুতে উঠে এ্যাটলাসের সঙ্গে কথা বলবে। ঠিক সেই সময় এক বিশাল পাত্র জলের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে তার দিকে চলে এল। হারকিলিস বুঝল এইটাই এ্যাটলাসের জল খাবার পাত্র। পাত্রটিকে নৌকো হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তার উপর উঠে পড়ল সে, নিজের লগুড়টাকে দাঁড় হিসেবে কাজে লাগাল ; লগুড়টা দিয়ে নৌকোটি বাইতে বাইতে দীঘির অপর পাড়ে এসে পৌঁছাল। মেঘ সরে যেতে এবারে সে দৈত্যটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। মাথাটা একটু নীচু করে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল এ্যাটলাস। হারকিউলিস যখন দৈত্যটার একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ল, তখন দেখল দৈত্যটার দুটো পায়ের মাঝখানে বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হারকিউলিসকে নীচে ঘুরতে দেখে দৈত্যটা চিৎকার করে বলল, 'কে তুমি আমার পায়ের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

হারকিউলিস জবাব দিল, 'আমি হারকিউলিস। হেসপিরিদিসের বাগানে যাওয়ার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি।' তারপরেই এ্যাটলাসকে পালটা প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

'আমি এ্যাটলাস। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দৈত্য আমি। কাঁধের
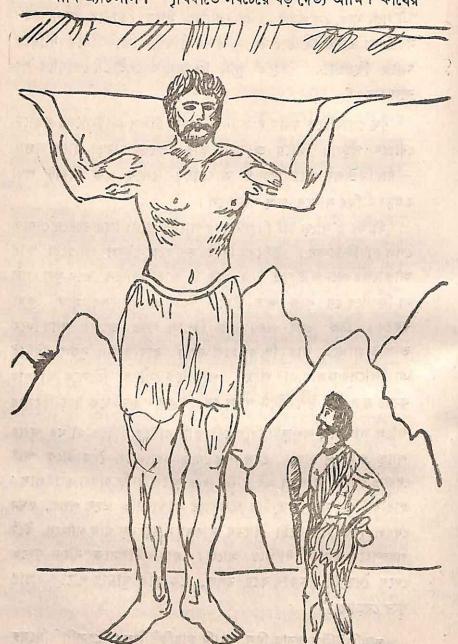
ওপর পৃথিবীটাকে ধারণ করে আছি আমি। তুমি কেন হেসপিরি-
দিসের বাগানে যেতে চাইছ?'

হারকিউলিস উত্তর দিল, 'আমি আমাদের রাজার জন্য তিনটি সোনার আপেল নিতে এসেছি।'

দৈত্যটা বলল, 'আমি ছাড়া আর কেউই সেই আপেলগুলো আনতে পারবে না। পৃথিবীর ভার যদি কিছুক্ষণ আমাকে বইতে না হয়, তাহলে আমি সোনার আপেল তিনটি নিয়ে আসতে পারি।

হারকিউলিস বলল, 'তুমি খুব দয়ালু। তুমি কি কিছুক্ষণ এই পাহাড়ের ওপর পৃথিবীর ভার চাপিয়ে দিতে পার না ?'

এ্যাটলাস বলল, 'পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়, কিন্তু হারকিউলিস, আমি শুনেছি তুমি বেশ শক্তিশালী। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তুমি তো কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর ভার বইতে পার ?'

হারকিউলিস সম্মত হল। পাহাড়টির ওপর উঠে এ্যাটলাসের কাঁধ থেকে পৃথিবীর ভার নিয়ে হারকিউলিস দাঁড়িয়ে পড়ল নিশ্চল ভাবে।

এ্যাটলাস দীঘিটাকে পিছনে ফেলে ভারমুক্ত হয়ে মনের আনন্দে কয়েক মাইল দূরে দূরে পা ফেলে লাফাতে লাফাতে হেসপিরিদিসের বাগানে গিয়ে সোনার আপেলগাছ থেকে সোনার আপেল তিনটি পেড়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল হারকিউলিসের কাছে।

এ্যাটলাসকে দেখে হারকিউলিস হাতে যেন চাঁদ পেল। পৃথিবীর এত বড় বোঝার ভারে তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে সেই ভার থেকে অব্যাহতি পাবে সে। এ্যাটলাসের হাতে সোনার আপেল তিনটি দেখে হারকিউলিসের আনন্দ হল ঠিকই কিন্তু পৃথিবীর ভার আর কতক্ষণ বইতে হবে, সেই চিন্তাই যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাকে। ধন্যবাদ জানিয়ে হারকিউলিস এ্যাটলাসকে বলল তার কাছ থেকে এবার আকাশের ভার নিয়ে নিতে।

উত্তরে এ্যাটলাস বলল, 'আমি কত হাজার বছর ধরে আকাশের ভার বইছি। এবারে একটু বিশ্রাম চাই। রাজা ইউরিথিয়াসের কাছে আমিই এই আপেল তিনটি নিয়ে যাব। একশো বছর আমার আর দেখা পাবে না। তারপরে আমি তোমার কাছ থেকে এই ভার বুঝে নিতে পারি।'

হারকিউলিস বলল, 'অত দীর্ঘ সময় আমার পক্ষে কাঁধের ওপর পৃথিবীর ভার নেওয়া সম্ভব হবে না, তুমি অল্পক্ষণের জন্য পৃথিবীটা ধরে রাখ। আমি আমার দেহের আচ্ছাদন, সিংহের চামড়াটাকে মাথার ওপর জড়িয়ে রাখব। পৃথিবীর ভারে আমার কাঁধ ও হাত যখন ব্যথায় অবশ হয়ে আসবে, তখন পৃথিবীটাকে মাথার উপর তুলে রাখব।'

এ্যাটলাস তাকে সাহায্য করতে রাজী হল। সোনার আপেল তিনটি মাটিতে রেখে পাহাড়ের নীচ থেকেই হারকিউলিসের কাছ পাহাড় থেকে পৃথিবীটার ভার হাতে তুলে নিল সে। এই সুযোগে হারকিউলিস পাহাড় থেকে নেমে এসে মাটিতে রাখা সোনার আপেল তিনটি নিয়ে দীঘির উপর ভাসমান সেই বিরাট পাত্রটিতে লাফ দিয়ে উঠে নিজের লগুড়টি দিয়ে সেটি বেয়ে নদী পার হয়ে গেল। এবার সে সোজা নিজের দেশ মাইসিনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। দেশে পৌঁছে রাজা ইউরিথিয়াসের হাতে হারকিউলিস তুলে দিল সোনার সেই তিনটি আপেল।

হারকিউলিসের এই দুর্ধর্ষ ক্ষমতায় হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন রাজা ইউরিথিয়াস। তিনি এরপর থেকে হারকিউলিসকে আজীবন সমীহ করে চললেন। আর তাকে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে বাধ্য করতে সাহস পান নি তিনি কোন দিন।

অশান্তির আপেল

সৃষ্টির আদিপর্বে পৃথিবীতে দেবতাদের আবির্ভাব হত এবং মানুষেরা দেবতাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ লাভ করতেন। পৃথিবীতে যখন দেবতারা লীলাখেলা করতেন মানুষের জীবনের ঘটনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দিতেন। মানুষের মধ্যে কখনও কখনও দ্বন্দ্ব-বিবাদের বীজ বপন করতেন এবং যুদ্ধের মুখেও ঠেলে দিতেন তাদের। তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ নীচের এই আখ্যান।—

একবার এক রাজা তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়েতে দেবদেবীদের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বিবাদ-অশান্তির দেবীকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়। রাজা তাঁকে নিমন্ত্রণ না করার ফলে দেবীর রোষ রাজার ওপর পড়ে। দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী রাণী জুনো, সৌন্দর্য ও ভালবাসার দেবী ভেনাস, জ্ঞানের দেবী মিনার্ভা একসঙ্গে বসেছিলেন অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে বিয়ের আসরে। সেই সময় সকলের অলক্ষ্যে বিবাদ-বিসংবাদের দেবী জানলা থেকে একটা সোনার আপেল ছুঁড়ে দিলেন ঐ তিন দেবীকে লক্ষ্য করে। আপেলটির গায়ে লেখা ছিল "এই আপেলটি সবচেয়ে সুন্দরী দেবীর জন্য।" তিনজনের

প্রত্যেকেই সোনার আপেলটির অধিকারী হওয়ার যোগ্যতার কথা বললেন। তিনজনের প্রত্যেকেই মনে করেন তিনিই সবচেয়ে সুন্দরী। আপেলটিকে নিয়ে যখন তাঁদের তিনজনের বিবাদ তুঙ্গে উঠল, তখন তাঁরা বিষয়টির ফয়সালার জন্য দেবরাজ জুপিটারকে সালিশী মানলেন। তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দরী এবং আপেলটি লাভ করার অধিকারী, এর মীমাংসার ভার নিতে জুপিটার রাজী হলেন না। তিনি যদি তাঁর স্ত্রী জুনোকে আপেলটি দেন তাহলে অন্য দুই দেবী ভেনাস ও মিনার্ভার রোষ তাঁর উপর পড়বে। আবার যদি আপেলটি ভেনাস বা মিনার্ভাকে দেন তাহলে তাঁর স্ত্রী তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। কোনো পথেই যাবার উপায় নেই। শেষে জুপিটার এক উপায়ের কথা বললেন। তিনি তাঁদের তিনজনকে ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের ছেলে প্যারিসের কাছে যেতে বললেন। প্যারিসই তাঁদের মধ্যে কে এই আপেল পাওয়ার যোগ্য তা সঠিক বলে দিতে পারবে, একথা বললেন জুপিটার তাঁদের তিনজনকে।

তিন সুন্দরী দেবী প্যারিসের কাছে গিয়ে তাঁকেই বিচারের ভার দিলেন তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দরী। তাহলেই সোনার আপেলটির উপর কার অধিকার থাকবে, ঠিক হয়ে যাবে।

জুনো প্যারিসকে বললেন সে যদি তাঁকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে রায় দেয় তাহলে তিনি তাকে এত ধনরত্ন দেবেন যার ফলে পৃথিবীতে তার সমকক্ষ ধনী ব্যক্তি আর কেউ থাকবে না। মিনার্ভা প্যারিসকে বললেন, যে কোন যুদ্ধে তার জয় সুনিশ্চিত করতে তিনি সবসময়েই তার পাশে থাকবেন। ভেনাস প্যারিসকে বললেন তিনি যদি তাঁকে আপেলটি দেন তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে পত্নী হিসাবে পাওয়ার সুযোগ করে দেবেন তাঁকে।

প্যারিস তিন দেবীকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ভেনাসকেই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বলে রায় দিলেন এবং তার ফলে ভেনাসই সোনার আপেলটির অধিকারী হলেন। ভেনাসের উপহারের কথাই প্যারিসকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি।

এর পর থেকে এই সোনার আপেলই বিবাদের আপেলরূপে চিহ্নিত হল স্পার্টা ও ট্রয়ের মানুষের কাছে। দুই রাজ্যের মধ্যে রক্ত-ক্ষয়ী দ্বন্দ্বসংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াল এই আপেল।

স্পার্টার রাজা মেনেলাসের স্ত্রী অসমান্যা সুন্দরী ছিলেন। তাঁর জগৎ-জোড়া খ্যাতির কথা শুনেছিলেন প্যারিস। মেনেলাসের কাছে রাজপুত্র প্যারিসের একবার যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। সেখানে মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনকে দেখেই প্যারিস বুঝতে পারেন যে দেবী ভেনাস এই অপরূপ সুন্দরীকেই তাঁর স্ত্রীরূপে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

হেলেনের প্রতি প্রবল অনুরাগ জন্মাল প্যারিসের। দেবী ভেনাস তাঁর ঐশীশক্তিতে প্যারিসের প্রতি হেলেনকে আকৃষ্ট করলেন। প্যারিসের প্রতি হেলেনেরও দুর্বলতা জন্মাল। পরিণতিস্বরূপ প্যারিস হেলেনকে নিয়ে নিজের দেশ ট্রয়ে পালিয়ে এলেন। প্যারিসের এই হঠকারিতার জন্যই ট্রোজান যুদ্ধের সূচনা হয়।

হেলেনের স্বামী ও স্পার্টার রাজা মেনেলাস প্যারিসকে অভি-সম্পাত দিতে লাগলেন এবং তাঁকে পরাভূত করে স্ত্রীকে উদ্ধার করে আনার জন্য ট্রয়ের বিরুদ্ধে সমুদ্রপথে সৈন্য নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন।

দশ বছর ধরে ট্রয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলেছিল। মেনেলাসের ভাই আগামেমনন স্পার্টার সৈন্যদের সেনাপতিত্ব করেন। প্রথম দিকে স্পার্টান সৈন্যরা যুদ্ধে জিতেছিল, পরের দিকে ট্রয়ের সৈন্যরা স্পার্টান সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে চলল। উভয়দিকেই বড় বড় সেনাপতিরা প্রাণ হারালেন। কিছু কিছু দেবী ট্রোজানদের পক্ষ নিলেন, আর কিছু কিছু দেবী স্পার্টনদের পক্ষ নিলেন।

ট্রয়ের বীর যোদ্ধা প্যারিসের ভাই হেক্টর দুর্ধর্ষ স্পার্টান বীর এ্যাকিলিসের বাণে বিদ্ধ হয়ে মারা যান। ট্রয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর এ্যাকিলিস হেক্টরের মৃতদেহকে ট্রয়ের সীমানা বরাবর পাঁচিলের ধার দিয়ে তিনবার মাটিতে টেনে নিয়ে ঘোরাল। প্যারিস ভাইয়ের হত্যার

প্রতিশোধ নেয় এ্যাকিলিসকে হত্যা করে। এ্যাকিলিস অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোঝা প্যারিসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্যারিসের এটা জানা ছিল যে এ্যাকিলিসের শরীরের একমাত্র দুর্বল স্থান, ডান পায়ের গোড়ালি ছাড়া তাঁর শরীরের অন্য কোথাও আঘাত করা সম্ভব নয় কারোর পক্ষে। এ্যাকিলিসের ডান পায়ের গোড়ালিতেই বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে বধ করলেন প্যারিস।

এ্যাকিলিসের মৃত্যুতে মেনেলাস বেশ অসুবিধায় পড়লেন। ট্রোজানদের সঙ্গে যুদ্ধে খামতি দিয়ে বুদ্ধির জোরে ট্রোজানদের হারাবার পরিকল্পনা করলেন। ট্রয় নগরীর পাঁচিলের পিছনে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেন। পাঁচিলের ওপারে স্পার্টানদের পালিয়ে যাওয়ার ফলে ট্রোজানদের মনে এই ধারণা হল যে স্পার্টানরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। ট্রোজানরা নিশ্চিন্ত হল যে স্পার্টানরা এবার জাহাজে পাড়ি দেবে নিজেদের দেশে, তাই যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত হল তারা।

এই সুযোগে মেনেলাস পাঁচিলের পেছনে স্পার্টান সৈন্যদের দিয়ে এক বিশাল কাঠের ঘোড়া তৈরি করলেন। কাঠের ঘোড়ার ভিতর ফাঁপা ছিল এবং তার এক ছোট্ট গোল দরজা ছিল, বন্ধ অবস্থায় দরজাটির অস্তিত্ব বোঝা অসম্ভব ছিল। কাঠের ঘোড়াটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হলে বেশ কিছু গ্রীক সৈন্য ঘোড়াটির পেটের ভিতর ঢুকে বসে থাকল। কিছু সৈন্য রাতের অন্ধকারে সেটিকে টেনে নিয়ে ট্রয়ের তোরণের সামনে রেখে দিল। বাইরে যেসব স্পার্টান সৈন্য ছিল তারা এবার তীরে অপেক্ষমান জাহাজে উঠে পাড়ি দিল।

পরদিন সকালে গ্রীক সৈন্যরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। কোথাও কোন স্পার্টান সৈন্যের চিহ্ন নেই, পাঁচিলের ওপর উঠে দেখল চারিদিক নিস্তব্ধ। সমুদ্রের তীরে বা সমুদ্রে কোন জাহাজ ও দেখল না তারা। স্পার্টান সৈন্যরা যে পালিয়েছে এবিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ হল। তোরণের সামনে দাঁড়ানো একটি বিশালাকার কাঠের ঘোড়া দেখে বিস্মিত হয়ে গেল তারা। স্পার্টানরা পালিয়ে গেল অথচ একটি

বড় কাঠের ঘোড়া ট্রয়বাসীদের উপহার স্বরূপ দিয়ে গেল কেন তা তারা বুঝে উঠতে পারল না।

ট্রয়ের প্রাচীন জ্ঞানী মানুষেরা ট্রোজান সৈন্যদের সাবধান করে দিলেন যে এটা স্পার্টানদের একটা ফন্দী। কিন্তু ট্রোজান সৈন্যরা একথায় বিশ্বাস করল না। ট্রোজান সৈন্যরা এই বিরাট কাঠের ঘোড়াটিকে তোরণ থেকে নগরের ভিতর নিয়ে এল। ট্রোজান সৈন্যরা ও আপামর ট্রয়বাসীরা সেই ঘোড়াটিকে ঘিরে সারাদিন বিজয়-উৎসব করল—নাচগান ও খানাপিনা হলো প্রচুর। মদের নেশায় চুর হয়ে গেল ট্রোজান সৈন্যরা। রাত নেমে এলে একেবারে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তারা।

এই সুযোগটির জন্যই অপেক্ষা করছিল স্পার্টান সৈন্যরা। কাঠের ঘোড়াটির ছোট্ট দরজাটি খুলে স্পার্টান সৈন্যরা মাটিতে নেমে পড়ল তখন। স্পার্টান সৈন্যদের জাহাজও মুখ ঘুরিয়ে এবার তীরে এসে ভিড়ল। স্পার্টান সৈন্যরা ট্রয়ের তোরণ খুলে নগরীর মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ঢুকে পড়ল। ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে দলে দলে অন্যান্য স্পার্টান সৈন্যরা ঐ তোরণ দিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে তাদের অগ্রগামী সৈন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রয় অবরোধ করে ফেলল। অসতর্ক ও নিরস্ত্র ট্রোজান সৈন্যদের সহজেই পর্যুদস্ত করে মেনেলাস হেলেনকে উদ্ধার করে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন সমুদ্র পথে।

অরফিউস ও ইউরিদিস

প্রাচীন গ্রীসের কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ অরফিউস সর্বকালের এক অবিস্মরণীয় নাম। বীণার তারে অতুলন ঝঙ্কার তুলে যাদুকণ্ঠে এমন ভাবাবেগের সঞ্চার ও সুরের মায়াজাল বিস্তার করতেন যে মানুষ, জীবজন্তু এমন কি গাছপালাও বিমুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়ত।

ইউরিদিসকে ভালবেসে অরফিউস বিয়ে করেছিলেন। অরফিউস ও ইউরিদিসের মতো সুখী দম্পতি সারা পৃথিবীতে দুর্লভ ছিল।

কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে এই সুখী দম্পতির জীবনে মহা অভিশাপ নেমে এল একদিন। সেদিন বনপরীদের সঙ্গে নাচতে নাচতে আত্মভোলা হয়ে ইউরিদিস এক সাপের গায়ে পা মাড়িয়ে দিয়েছিল; সাপটি ছিল ভয়ানক বিষধর এবং ঐ সাপের ছোবলেই প্রাণ হারান তিনি। তাঁর আত্মা ঠাঁই পেল পৃথিবীর অতলে অন্ধকার জগতে।

ইউরিদিসের এই অপঘাদ মৃত্যুতে অরফিউস শোকেতাপে পাগলের মত হয়ে গেলেন। স্ত্রীর বিরহে এমন যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়লেন যে ঘরে আর তিনি বসে থাকতে পারলেন না। বীণাটি

হাতে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পথে পথে বীণা বাজিয়ে ইউরিদিসের উদ্দেশে এমন মর্মবিদারী গান গেয়ে চললেন যে পথের মানুষ, এমন কি জীবজন্তু তাঁর দুঃখে চোখের জল ফেলতে লাগল। দেবতারা ওপর থেকে ইউরিদিসের সকরুণ গান শুনে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। কিন্তু সকল আত্মার আবাসভূমি, পরলোকের অধীশ্বর প্লুটোর ওপর হাত নেই তাঁদের। তাই সহানুভূতিশীল হলেও এক্ষেত্রে দেবতারা অসহায়।

অরফিউস যেন অনন্ত পথ হেঁটে চলেছেন, চলার শেষ নেই তাঁর। দিনরাত পথ পরিক্রমা করতে করতে অবশেষে একদিন পাতালের গর্ভে পরলোকের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মোহজাল সৃষ্টিকারী গান ও বীনার মূর্ছনায় পরলোকের দ্বার আপনা থেকেই খুলে গেল। বীণা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তিনি পরলোক পরিক্রমা করতে শুরু করলেন।

পরলোকে বিদেহী আত্মারা ঝঙ্কৃত বীণার সুর-ছন্দ সহযোগে এমন সুরেলা কণ্ঠস্বরে গান শোনেন নি কখনও। পরলোকের কৃষ্ণনদ স্টিক্স পারাপার করে যে মাঝি চারোন সেও অরফিউসের গানে বিমুগ্ধ হয়ে গেল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অরফিউসকে নৌকোয় ষ্টিক্স পার করিয়ে দিল চারোন।

দুষ্ট ও পাপী লোকেরা পৃথিবীতে তাদের অন্যায় কাজের জন্য পরলোকের নানারকম শাস্তি ভোগ করে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাদের। একজন অত্যাচারী রাজা যে তার প্রজাদের ওপর নিপীড়ন চালাত, তাকে এখানে একটা পাথরের চাঙড়াকে পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে তুলতে দেখল অরফিউরিস। যতবারই সে চাঙড়র পাহাড়ের ওপর তুলছিল, ততবারই সেটা গড়িয়ে পড়ছিল নীচে। তার এই অমানুষিক পরিশ্রমের কাজে এক মুহূর্ত বিরতি ছিল না। কিছু স্ত্রীলোক যারা বাড়ীর চাকর চাকরানীদের ওপর দুর্ব্যবহার করত, তাদের দেখা গেল, ঈন্দারা থেকে ফুটো বালতি নিয়ে জল তুলতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য—বালতি ফুটো থাকায় বারে বারে বালতিটাকে

ইন্দারায় ডুবিয়ে জল তুলতে হচ্ছে তাদের। ট্যানটালাস নামে একজন ধনী ও কৃপণ লোক নিজের পরিবারের লোকজনদের সারাজীবন কষ্টকর অবস্থার মধ্যে রেখেছিল। তাকে এখানে দেখা গেল ক্ষিদের জ্বালায় অবিরাম ছটফট করতে। তার সামনে টেবিলের উপর থরে থরে খাবার সাজানো আছে, অথচ সে হাত বাড়িয়েও সেই খাবার স্পর্শ করতে পারছে না। অরফিউরিস এইসব আত্মাদের পাশে ঘুরতে ঘুরতে ইউরিদিসকে কেন্দ্র করে হৃদয়বিদারক গান গেয়ে চলল! কি অপরূপ দেখতে ইউরিদিসকে, কেমন অনবদ্য তার নৃত্যভঙ্গিমা ছিল, কিভাবে এই নৃত্যই তার জীবনে চরম পরিণতি নিয়ে এল— তাকে হারিয়ে অরফিউরিসের নিজের মনের অবস্থা এখন কিরকম, ইউরিদিসের বিরহজ্বালা সহ্য করতে পারছে না কেন সে, কেন তাকে ছাড়া জীবন রাখা নিরর্থক মনে হচ্ছে তার—এই সব কথাই অনুরণিত হচ্ছিল তাঁর বিরামহীন গানে।

বিদ্রেহী আত্মার জগতে যারাই অরফিউসের গান শুনল, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল তারাই, তাঁদের সবার চোখে জল এসে গেল ; তারা সবাই প্লুটোর কাছে অরফিউসের দুঃখের কথা বলে ইউরিদিসের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বলল। যে দুষ্ট রাজা পাথরের চাঙড় ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ে তুলছিল তার কাছে এখন সেই পাথরের চাঙড় অনেক হালকা বোধ হল অরফিউসের গানের মহিমায়, স্ত্রীলোকগুলি যারা ইন্দারা থেকে ফুটো বালতিতে জল তুলছিল। তারাও আর তৃষ্ণার্ত- বোধ করল না। ট্যানটালাস ও আর ক্ষুধার্তবোধ করল না, অরফিউসের হৃদয়বিদারী গান শুনে সেও নিজের শরীরের দুঃখকষ্ট ভুলে গেল। অরফিউসের জন্য পরলোকের অধিবাসীরা সকলেই মুহ্যমান হয়ে পড়ল দুঃখে।

প্লুটোর স্ত্রী প্রসেরপাইন সে সময় ছিলেন প্লুটোর কাছে এই বিদেহী আত্মার দেশে। বছরে ছ'মাস প্লুটোর কাছে থাকতেন তিনি, বাকি ছ'মাস পৃথিবীতে থাকতেন। প্রসেরপাইন ও অরফিউসের মর্মভেদী গান শুনতে পেলেন তিনি। কান্না সংবরণ করতে পারলেন

না তিনি। স্বামীর কাছে তিনি ইউরিদিসের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। প্লুটো নিজেও অরফিউসের গান শুনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। অরফিউস ও ইউরিদিসের উপর তার সহানুভূতি হল। অবশ্য প্লুটোর কাছে এটা একটা ব্যতিক্রম। মৃত্যুপুরীর রাজা প্লুটোর মনে কখনই কারোর মৃত্যুতে ভাবান্তর আসে নি কোনো। মৃতের আত্মাকে পরলোকে নিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আসে না তার মধ্যে। কিন্তু প্লুটোর সুকঠোর মনকে বেদনার্দ্র করে দিল অরফিউসের গান—অভিভূত হয়ে গেলেন প্লুটো, অরফিউসের মর্মবিদারী গানে। ইউরিদিসকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমাকে আর পরলোকে আত্মার রূপ নিয়ে থাকতে হবে না। তুমি অরফিউসের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আবার মানব জীবন যাপন করতে পারবে।' তারপরে অরফিউসকে ডেকে বললেন, তুমি ইউরিদিসকে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যাও। আমি তোমার ব্যথার ব্যথী। তুমি আর ইউরিদিস এই পাতালপুরী থেকে উপরে পৃথিবীতে ফিরে যাবে, তুমি আগে, আর তোমাকে অনুসরণ করবে ইউরিদিস অর্থাৎ ইউরিদিস তোমার পাশাপাশি হাঁটবে না, তোমার পিছু পিছু যাবে। কিন্তু মনে রেখ, চলার সময় তুমি ভুলেও পিছনে তাকাবে না। তাহলে তোমার ইউরিদিসকে চিরতরে হারাবে এবং এই আত্মার পুরীতেই চিরকাল থাকবে সে।

অরফিউসের সমগ্র সত্তা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাঁর বীণায় আর কণ্ঠে এখন অন্য সুর—জীবনের আনন্দ-সুখের স্বতোৎসারিত দ্যোতনা। পাতালপুরী থেকে অরফিউস ফিরে চলেছে আনন্দময় সুরঝঙ্কার তুলে, পিছনে পিছনে তাকে অনুসরণ করছে তাঁর স্ত্রী ইউরিদিস। পাতালপুরীর সীমানার মধ্যে স্ত্রীকে ফিরে দেখার উপায় নেই, অরফিউসের, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালেই চিরদিনের মত তাঁকে হারাতে হবে তাঁর প্রাণের ইউরিদিসকে।

চারোন মাঝি অরফিউসকে স্টিক্স নদী পার করিয়ে দিল। ইউরিদিস পিছনে পিছনে আসছে অথচ অরফিউস কোন সাড়া পাচ্ছে

না তার। পাবে কেমন করে, যতক্ষণ পাতালপুরীতে আছে সে, ততক্ষণ ইউরিদিসকে আত্মার রূপেই থাকতে হবে।

"পাতাল-জগতের শেষে সীমানার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছোল অরফিউস। পাতালজগতের দ্বারপ্রান্ত থেকে বাইরের সুন্দর পৃথিবী চোখের সামনে ভেসে উঠল। সূর্য, শস্যশ্যামল প্রান্তর, পত্রপুষ্প-শোভিত গাছগাছালি, দীঘি, নদনদী পৃথিবীকে অপরূপ সাজে রেখেছে। গাছে গাছে পাখির কলতানে মুখরিত পৃথিবী, কপোত-কপোতীর প্রেমে উচ্ছ্বসিত পৃথিবী, মানুষে মানুষে প্রেম-ভালবাসায় প্রাণবন্ত পৃথিবী। প্রেম ও সুন্দরের আধার এই যে পৃথিবী—আবার তাকে দেখতে পেয়ে অরফিউস আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল—ইউরিদিস সঙ্গে থাকায় পৃথিবী যেন এক নতুন রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার কাছে—পিছনে ফিরে দেখতে গেল ইউরিদিসকে, ভুলে গেল প্লুটোর সাবধান বাণী। ইউরিদিস প্রচণ্ড আর্তনাদ করে অরফিউসের দিকে হাত বাড়িয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল—আত্মার আবাসস্থল এই পাতাল-পুরীতে এবার কেউই আর অরফিউসকে সহানুভূতি দেখাল না। পাতালপুরীর ফটকের পাশে ন'দিন ন'রাত দাঁড়িয়ে থাকল অরফিউস—তাঁর বীণা আর কণ্ঠের করুণ সুরে কোন ফলই হল না আর। কেউই আগ্রহ দেখাল না তার দুঃখের কথা শুনতে। ইউরিদিসকে চিরতরে হারাল সে।

অরফিউস ও ইউরিদিসকে দেবতারা বরাবরই ভালবাসতেন অকুণ্ঠিতভাবে। অরফিউসের মৃত্যুর পর তাঁর বীণাটিকে দেবতারা আকাশে তারাদের মাঝে স্থাপন করলেন। নক্ষত্রখচিত আকাশে বীণাটিকে দেখা যায় আজও।

ক্যালিসতো ও আরকাস

বন্যজন্তু অধ্যুষিত ঘন সবুজ জঙ্গলে ঘেরা আরকাডিয়া গ্রীসের এক মনোরম অঞ্চল। এই আরকাডিয়াতে বহুকাল আগে অপূর্ব সুন্দরী ক্যালিসতো ও তার ছেলে আরকাসকে দেখা যেত জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শিকার করতে।

একদিন দেবরাজ জুপিটার অলিমপাস থেকে নীচে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখল আরকাডিয়ার এক বনাঞ্চলে ক্যালিসতো ও তার ছেলে আরাকাস একটি হরিণের পিছু পিছু বর্শা হাতে নিয়ে ছুটে চলেছে। ক্যালিসতোর রূপ দেখে জুপিটার মুগ্ধ হয়ে গেল। রাণী জুনোর কাছে জুপিটার ক্যালিসতোর রূপের বর্ণনা দিলেন উচ্ছ্বসিত-ভাবে। স্বামীর মুখে ক্যালিসতোর রূপের প্রশংসায় অসন্তুষ্ট হলেন জুনো। দেবী জুনো জুপিটারের মুখে অন্য কোন দেবীর প্রশংসাই সহ্য করতে পারতেন না, আর তুচ্ছ এক মানবীর প্রশংসা স্বামীর মুখে শুনে তো তিনি ক্ষুব্ধ হবেনই। যতই স্বামীর মুখে ক্যালিসতোর প্রশংসা শুনতে লাগলেন, ক্যালিসতোর ওপর জুনোর ঘৃণা ততই বাড়তে লাগল। শেষে একদিন জুনো প্রচণ্ড আক্রোশে আরকাডিয়ার

জঙ্গলে ক্যালিসতোকে একাকী পেয়ে তাকে একটি কালো ভালুকে পরিণত করলেন। ক্যালিসতো ভালুকে পরিণত হবার পর হিংস্র জীবজন্তুদের ত্রিসীমানায় পা বাড়াত না। জঙ্গলের জীবজন্তু-বিরল ফাঁকা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত সে।

একদিন আরকাস শিকারের উদ্দেশে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে ক্যালিসতোকে দেখতে পেল। ক্যালিসতো জঙ্গলের এক পরিষ্কার জায়গায় গা ছড়িয়ে বসেছিল। আরকাসকে দেখেই লাফাতে লাফাতে উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করতে গেল তাকে। মা ছেলেকে বহুদিন পর দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আরাকাস মাকে চিনবে কি করে? ভালুক তো আর তার মা হতে পারে না। তার মা হারিয়ে গিয়েছে এই বনের মধ্যেই—অপমৃত্যু হয়েছে তাঁর এইটাই ধরে নিয়েছিল সে। আরকাস ভালুকটিকে লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে তার বুকের দিকে তাক করে বল্লম ছুঁড়তে গেল। জুপিটার অলিম্পাস থেকে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখছিলেন। পুত্রের অজান্তে পুত্রের হাতে মাতার মৃত্যু হবে—এ মহা দুঃস্বপ্ন বৈ কিছু নয়। যে মুহূর্তে আরকাস তার বল্লমটি ছুঁড়তে গিয়েছিল, ঠিক তখনই তাকে একটা ছোট ভালুকে পরিণত করলেন জুপিটার। বড় ভালুক ও ছোট ভালুককে আকাশে নক্ষত্ররাজির মধ্যে চিরদিনের জন্য স্থান দিলেন তিনি।

রাতের আকাশে ছায়াপথের দিকে নজর দিলে ভালুকের আকৃতি-বিশিষ্ট দুটি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা—এরাই ক্যালিসতো ও আরকাস।

জ্যাসন ও যুদ্ধ জাহাজ আরগো

বহু পুরোনো যুগের কথা। জ্যাসন নামে এক শক্তিধর মানুষের কথা জানা যায়। জ্যাসন যখন ছোট্ট শিশু ছিলেন তখন জ্যাসনের বাবাকে তার এক দুষ্ট ভাই দেশের রাজার আসন থেকে উৎখাত করে নিজেই রাজ-সিংহাসনে বসে। তার পিতাকে তার খুড়ো দেশছাড়া করে দেন।

জ্যাসনের পিতা জ্যাসনকে এক পাহাড়ের উপর একটি ছোট্ট কুটীরে বসবাসকারী তার এক পুরোনো বিজ্ঞ বন্ধুর হাতে সঁপে দিলেন যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তাকে। তার এই পিতার বন্ধুটির নাম চিরন। চিরন হল এক সেন্টর, তার শরীরের ওপর দিকটা মানুষের আর নীচের দিকটা ঘোড়ার। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঘোড়া এই সেন্টর অত্যন্ত সৎ, আদর্শবান ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। দেবদেবীরা পর্যন্ত তাঁদের সন্তানদের সেন্টরের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও চিরন ছেলেদের দ্রুত দৌড়নোর শিক্ষা দিত। তীর-ধনুক চালনা করার শিক্ষাক্রম ছিল তার বিদ্যালয়ে,

কিভাবে সুস্থভাবে ও আনন্দময় পারবেশে মানুষ জীবন-ধারণ করতে পারে, জীবনের সে মূল শিক্ষাও দিত তাদের—জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা ও সহৃদয়তার পরিচয় যাতে তাঁর ছাত্ররা দিতে পারে তার জন্য তাদের মনকে ফুলের মত গড়ার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন তিনি।

চিরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষাধারা অনুসরণ করে জ্যাসন মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠল। জ্যাসন বড় হলে চিরন তাকে জানালেন যে তার পাঠক্রম শেষ হয়েছে। এবারে তার স্বাধীন জীবন-যাপন করার সময়। দরদভরা প্রাণে বিদায় জানিয়ে চিরন বললেন তাকে, তোমার পিতাকে তোমার দুষ্ট খুড়ো রাজ্যচ্যুত করে নিজেই রাজা হয়ে বসেছে। তাকে রাজ-সিংহাসন থেকে সরিয়ে তোমার পিতাকে তাঁর রাজ-সিংহাসন প্রত্যার্পণের গুরুদায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। জ্যাসন প্রতিজ্ঞা করল যে সে এই ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিকার করবেই।

দেশে যাওয়ার পথে মজে যাওয়া একটি নদী পার হওয়ার সময় জ্যাসন এক অসহায় বৃদ্ধাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নদী পার করে দেয়। বৃদ্ধা ওপারে গিয়ে নিজের প্রকৃত রূপ দেখায় জ্যাসনকে। জ্যাসন দেখলেন, এ এক দেবী, বৃদ্ধার ছদ্মবেশে তাকে পরীক্ষা করছিলেন।

জ্যাসন দেশে এসে প্রথমেই সোজা রাজপ্রাসাদে এসে ঢুকল। তার দুষ্ট কাকা এই রাজপ্রাসাদ থেকে তার পিতাকে বহিষ্কৃত করে রাজ্য দখল করে আছে। জ্যাসনকে দেখে তার কাকা মোটেই খুশী হলেন না। জ্যাসন সরাসরি তাঁকে বলল, 'আমার পিতার রাজ্য আপনার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।'

জ্যাসনের কাকা বুঝতে পারলেন তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ না করলেও এই তরুণ ও শক্তিমান পুরুষটি অনায়াসে বাহুবলে এই রাজ্য তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে।

জ্যাসনের কাকা জ্যাসনকে আমন্ত্রণ করলেন পরের দিন তাঁর প্রাসাদে একটি ভোজ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

পরদিন রাজপ্রাসাদে খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হলে রাজা অভ্যাগত

অতিথিদের সঙ্গে খোশমেজাজে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। জ্যাসনও সেখানে উপস্থিত হলেন। কথাবার্তা চলাকালীন রাজা হঠাৎ সকলকে থামিয়ে তাদের একটি গল্প বলতে শুরু করলেন—

"সুদূর অতীতে একবার এক সুন্দর সোনালী ভেড়ার আবির্ভাব হয় এই রাজ্যে ; শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারত সে। এক দেবী একে পাঠিয়েছিলেন এই রাজ্যে তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্যে --তাঁর শিশুসন্তানদের হত্যা করার পরিকল্পনা দেবী আগেভাগেই জেনে ছিলেন। ভেড়াটি দেবীর ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পিঠে নিয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে আকাশপথে উড়ে যাওয়ার সময় ভেড়াটির পিঠ থেকে ছোট মেয়েটি আকস্মিক সমুদ্রে পড়ে যায়। ছেলেটি অবশ্য ঠায় ভেড়াটির পিঠের উপরে ছিল। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে রাজা ইতিসের দেশে তাকে নিয়ে এল ভেড়াটি।

ভেড়াটির গায়ে সোনার উল দেখে রাজা ইতিস চমকিত হলেন ; ভেড়াটির গা থেকে ঐ মূল্যবান সোনার উল নেবার ইচ্ছা জাগল তার মনে। তিনি তাঁর লোকদের দিয়ে ভেড়াটিকে মেরে তার ছাল খুলিয়ে নিলেন। তারপর সোনার উলভর্তি সেই ছালের টুকরোটিকে তার বাগানে একটি গাছে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখলেন। সোনালী লোমের পাহারায় রাখলেন তিনি এক ভয়ঙ্কর আকৃতির অগ্নিবর্ষী সাপ ড্রাগনকে। সেই মহামূল্য সোনালী মেষলোম সংগ্রহ করতে কত লোক অভিযান চালিয়েছে আজ এ পর্যন্ত, কিন্তু কেউই তা নিয়ে আসতে পারে নি।"

গল্পটি শেষ করে জ্যাসনের খুড়ো সমাগত অতিথিদের বললেন, 'এই যে জ্যাসনকে আপনারা দেখছেন, তার ইচ্ছা কি জানেন, এই রাজ্যের রাজা হতে চায় সে। কিন্তু রাজা হওয়ার আগে রাজোচিত পৌরুষকার ও শৌর্যবীর্য তার মধ্যে আছে কিনা যাচাই করা প্রয়োজন। আপনাদের যিনি রাজা হবেন, তাঁর শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই পূর্বেই আপনাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাই আমি বলছি

যদি জ্যাসন সোনালী লোম নিয়ে আসতে পারে দেশে, তাহলে আমি সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে রাজা হিসাবে বরণ করব তাকে।

সকলেই রাজার কথায় সায় দিল। জ্যাসন বলল সে রাজী আছে এই কাজ করতে। এই অভিযানের জন্য বড় একটি জাহাজ তৈরি করার কাজে রাজার সাহায্য চাইলে তিনি সম্মত হলেন। জ্যাসনের কাকা মনে মনে নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে জ্যাসনের হাত থেকে চিরতরে রক্ষা পাওয়া গেল। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরে ইতিসের রাজ্যে ড্রাগনের হাতে প্রাণ দিতে হবে তাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, আর ফিরে আসবে না জ্যাসন।

চিরনের বিদ্যালয়ে জ্যাসনের যারা সহপাঠী ছিল তারাই দেশে সবচেয়ে শক্তিমান ও সাহসী মানুষ হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। জ্যাসন এই অভিযানের সাথী করে নিল তাদের। আরগুস নামে তার এক সহপাঠী ছিল, সে জাহাজ তৈরিতে পারদর্শী ছিল। তার পরিকল্পনামত ও নির্দেশে জ্যাসন এবং তার বন্ধুরা সেই বিরাট জাহাজটি তৈরি করে ফেলল। জাহাজটির পরিকল্পনাকারী আরগুসের নাম অনুসারে জ্যাসন জাহাজের নাম রাখল আরগো।

যে দেবীকে জ্যাসন সাহায্য করেছিলেন, সেই দেবী জ্যাসনকে এক টুকরো কাঠ এনে দিয়ে বললেন সেটি জাহাজের ভিতরে রাখতে। কোন কিছু জানতে চাইলে বা কোন সমস্যার সমাধান করতে চাইলে এই কাঠের টুকরো সহায়তা করবে তাকে, বললেন সেই দেবী।

সমুদ্র-তটে বালির ওপর জাহাজটির নির্মাণ-কাজ শেষ হলে সেটিকে জলে ভাসাবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু হল। জাহাজটির নীচে বড় বড় গাছেরগুঁড়ি রাখা হল, জাহাজটিকে ঠেললে যাতে গড়িয়ে জলে নেমে যায়। কিন্তু জাহাজটি এত বড় ও ভারি ছিল যে জ্যাসন ও তার লোকেরা কিছুতেই সেটিকে নড়াতে পারল না। জ্যাসনের অন্যতম বন্ধু ছিল হারকিউলিস, যার শক্তিমত্তার খ্যাতি পৃথিবীজোড়া ছিল, সেও জাহাজটাকে নড়াতে পারল না। শেষে জ্যাসনের অপর এক বন্ধু, স্বর্গ ও মর্তবাসীর প্রিয় কবি ও বন্ধু এই পৃথিবীরই এক

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ অরফিউস এগিয়ে এল ঐ জাহাজকে নড়াতে, শক্তিপ্রয়োগে নয়, গানের মায়াজাল বিস্তার করে। অনুপম ভাবব্যঞ্জনা ও সুরলহরীর সমাহারে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠলেন অরফিউস—'জাহাজের রূপ পরিগ্রহ করতে পারতেন যদি তিনি, আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকত না তাঁর', গানের মধ্যে দিয়ে বললেন —'এই জাহাজ হয়ে তিনি যদি সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিতে পারতেন পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করত তাঁর জীবন।

জ্যাসনের জাহাজ আরগো এবার নড়ে উঠল। অরফিউসের গানের আবেগসঞ্চারী কথা ও সুর আরগোসকে টলিয়ে দিল। ধীরে ধীরে জাহাজ জলে নেমে পড়ল। জ্যাসন আর তার বন্ধুদের আনন্দ ধরে না। তারা চটপট জাহাজে উঠে পড়ে পাল তুলে দিল জাহাজের —আরগো তরতর গতিতে যাত্রা শুরু করে দিল।

জ্যাসনের সাহায্যকারী দেবীর অনুরোধে পবনদেবতা আরগোর অনুকূলে বাতাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করলেন।

জ্যাসন আর তার সঙ্গীরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশে জাহাজ থামিয়ে জাহাজের লোকেদের জন্য পর্যাপ্ত জল ও খাবারের ব্যবস্থা করতে করতে চলল ইতিসের দেশে—সোনালী মেষলোমের দেশে। জ্যাসন প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে চলেছে ইতিসের দেশে। যদি সে সোনালী মেষলোম নিয়ে ফিরে আসতে পারে দেশে, তাহলে কাকার কাছ থেকে ফিরে পাবে তার পিতার রাজ্য।

রাজা ইতিস একদিন সমুদ্রতীরে দেখলেন এক বড় জাহাজ তার দেশের দরিয়ায় ভিড়ছে। তিনি ভাবলেন এই জাহাজে করে শত্রু-পক্ষের কেউ সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। ইতিস তাঁর সৈন্যসামন্তদের নিয়ে সমুদ্র তীরে এসে দাঁড়ালেন, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায়।

জ্যাসন তীরে সারবন্দী সৈন্যবাহিনী দেখে ভুল বোঝাবুঝি নিঃসনে জাহাজে সাদা পতাকা তুলে নিলেন। ইতিসও বুঝলেন এরা কান শত্রুপক্ষের লোক না। জাহাজটি ধীরে এসে তীরে ভিড়লে প্রথমে

জ্যাসন নেমে এসে রাজা ইতিসের কাছে মাথা নীচু করে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। রাজাকে বলল সে, মারামারি হানাহানি করতে সে এ রাজ্যে লোকজনদের নিয়ে আসে নি। সে এসেছে শুধু সোনালী মেষলোম নিতে। যত মূল্যেই হোক, কিনবে সে এটা। যদি রাজা তাকে সাহায্য করেন এই সোনালী মেষলোম সংগ্রহ করতে, বলল সে, রাজার শত্রুদের বিনাশ করতে সাহায্য করবে সে।

ইতিস তার সোনালী মেষলোমের অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না। তাই বললেন জ্যাসনকে, 'তুমি যদি প্রমাণ করতে পার যে তুমি আমারই মত অসম সাহসিক মানুষ তাহলেই তোমাকে আমি সোনালী মেষলোমের অধিকার ছেড়ে দিতে পারি। শোন, আমার দুটো ষাঁড় আছে, তাদের মুখ থেকে আগুনের গোলা বেরোয়। আমি ছাড়া কেউই এই ষাঁড় দুটির সামনে যেতে পারে না। এই ষাঁড় দুটিকে ধরতে হবে তোমাকে। লাঙ্গলের সঙ্গে বাঁধতে হবে তাকে, আমার ক্ষেত কর্ষণ করবে তুমি এই ষাঁড়টিকে দিয়ে। ক্ষেত চষা হয়ে গেলে কিছু ড্রাগনের দাঁত তোমাকে দেব। তুমি সেগুলি সারবন্দী করে পুঁতে দেবে ক্ষেতের মাটিতে। প্রত্যেকটি ড্রাগনের দাঁত এক একটি সৈন্য হয়ে ক্ষেতে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আমি ছাড়া আর কেউই তাদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতে পারে না। তুমি যদি এই কাজ করতে সমর্থ হও, তাহলে আমি বুঝব, আমার সমান শক্তিধর মানুষ তুমি। তখনই আমি তোমাকে সোনালী মেষলোম দেব।'

রাজা ইতিস নিশ্চিত ছিলেন জ্যাসন পিছিয়ে আসবে এই কাজ থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! জ্যাসন বলল সে একাজ পারবে। ইতিমধ্যে রাজকন্যা মিডিয়া সেখানে এসে শুনল সবকিছু। জ্যাসনকে তার ভাল লেগে গেল। তার ওপর মায়া হল তার। এইভাবে এই তরুণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, এটা সে বুঝলেও পিতার কাছে প্রকাশ করতে সাহস পেল না। সে আড়ালে জ্যাসনকে ডেকে নিয়ে তাকে ফিসফিস করে বলল যে তাকে সে এ

ব্যাপারে সাহায্য করবে। সেই রাতে জ্যাসনের জাহাজে এসে মিডিয়া জ্যাসনকে একটি তেলের পাত্র দিয়ে বলল, এই তেল গায়ে মাখলে শরীরে এমন শক্তি জন্মাবে যে কোন কিছু আঘাত তাকে কাবু করতে পারবে না।

পরের দিন সকালে উন্মুক্ত মাঠে জ্যাসনের সঙ্গে তুটি ষাঁড়ের লড়াই দেখতে রাজা এবং তাঁর পারিষদেরা এসে উপস্থিত হলেন। মিডিয়া যে তেল জ্যাসনকে দিয়েছিল সেটি মেখে এমন শক্তিধর হয়েছিল জ্যাসন যে, ষাঁড় তুটি তার দিকে ছুটে আসা মাত্র সে পলকে তাদের শিং ধরে মাটিতে আছড়াতে লাগল। ষাঁড় তুটো আছাড়ের চোটে বেশ অবসন্ন হয়ে পড়ল যখন, জ্যাসন তাদের শিঙগুলোকে বেঁধে ফেলল। তারপর তাদের সঙ্গে লাঙ্গল জুড়িয়ে তাদের দিয়ে রাজার ক্ষেত চষিয়ে নিল। তারপর সে রাজার কাছ থেকে ড্রাগনের কিছু দাঁত নিয়ে ক্ষেতে পুঁতে দিতে লাগল। এক একটি দাঁত পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ভয়ঙ্কর সৈন্য মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মাটি থেকে বেরিয়ে প্রত্যেকেই জ্যাসনকে আক্রমণ করতে গেল। জ্যাসন বুদ্ধি করে একটা পাথর ক্ষেতের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল, যার গায়ে পাথরটি লাগল সে ভাবল তার পিছনের সৈন্যটি ছুঁড়েছে সেটি। অমনি সে পিছনে ফিরে ঐ সৈন্যটিকে মেরে ফেলল। এইভাবে জ্যাসন ইতস্তত মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে পাথর ছুঁড়তে লাগল। আর ক্ষেতের মধ্যে সৈন্যরা একে অপরকে সন্দেহ করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে সকলে শেষ হয়ে গেল। রাজা ইতিসের সমতুল সাহসী পুরুষ হিসাবে জ্যাসন তাঁর কাছে এসে সোনালী মেষলোম দাবী করল। রাজা একদিনের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

জ্যাসন সেদিনকার মত রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাথীদের সঙ্গে তার জাহাজ আরগোতে গিয়ে উঠল। জ্যাসন চলে যেতেই ইতিস তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'জ্যাসন সোনালী মেষলোম নিতে পারবে না, ড্রাগনের হাতে সে প্রাণ হারাবেই। কিন্তু আমি চাই

জ্যাসনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার সাথীদেরও যেন হত্যা করা হয়। তাহলে আমার ষাঁড়েদের সঙ্গে লড়াইয়ে জ্যাসন যে বীরত্ব দেখিয়েছিল তার খবরও কেউ আর পাবে না।' আড়াল থেকে সবকথা শুনল মিডিয়া।

সেই রাতে 'আরগো'-জাহাজে উঠে জ্যাসনকে রাজার অভিপ্রায়ের কথা বলল মিডিয়া এবং তাকে পরামর্শ দিল যে সে যদি আজ রাতেই সোনালী মেষলোম নিয়ে দেশে রওনা দেয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে তো।

তখন জ্যাসন তার বন্ধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীতজ্ঞ অরফিউসকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ইতিসের রাজার বাগানে গেলেন সঙ্গোপনে। সোনালী মেষলোমের পাহারায় রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনটি। সেটিকে দেখামাত্রই শিহরিত হল তাঁরা। ড্রাগনটির রক্তলাল চোখে তাঁদের যেন ভস্ম করে দিচ্ছিল। তার মুখ দিয়ে আগুনের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তার মাথার উপরে গাছের গুঁড়িতে টাঙ্গানো সোনালী মেষলোমে ঢাকা চামড়াটি জ্যোৎস্না রাতে জ্বলজ্বল করছিল।

অরফিউস তাঁর সুরেলা কণ্ঠে গানের ফোয়ারা বইয়ে দিয়ে ড্রাগনটিকে ধীরে ধীরে আবিষ্ট করেতুললেন। ড্রাগন অরফিউসের নেশা ধরানো গানে মাতোয়ারা হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে আবেশে আবেগে একটা চোখ বুজে ফেলল। তারপর আর একটি চোখও বুজে এল তার। তারপর সে তার দেহটা এলিয়ে দিল মাটিতে, ঘুমের নেশায় ভারি হয়ে এল তার চোখ—মুহূর্ত-মধ্যে অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে রইল সে। এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল জ্যাসন।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেই জ্যাসন সাহস সঞ্চয় করে ড্রাগনের মাথায় পা রেখে গাছ থেকে সোনালী মেষলোমের চামড়াটি পেড়ে নিল। অরফিউস তখনও পাশে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় সুমধুর সুরজাল বিস্তার করে চলেছেন।

দুজনে এবার চামড়াটি নিয়ে নিঃশব্দে রাজার বাগান থেকে বেরিয়ে

গিয়ে একেবারে 'আরগো'তে এসে উঠে পড়লেন। মিডিয়াও তাদের সঙ্গ নিল। জ্যাসন তাকে সঙ্গে নিল তার অকৃত্রিম ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ; তাছাড়া তাকে এখানে রেখে গেলে মৃত্যু তার অবধারিত ছিল, কেননা ইতিস এই ঘটনায় তার কন্যার ভূমিকার কথা জানতে পারলে তাকে প্রাণদণ্ড দিতেন।

জ্যাসন, মিডিয়া এবং তাদের সঙ্গী সাথীরা যখন সোনালী মেষ-লোম নিয়ে দেশে ফিরল তখন দেশের লোকেরা জ্যাসনের কাকাকে রাজসিংহাসন থেকে সরিয়ে জ্যাসনকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করল। জ্যাসন ও মিডিয়া পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল। 'সেনটর' চিরনের আশীর্বাদধন্য তরুণ এই রাজা জ্যাসন ও রাণী মিডিয়া দেশের লোকেদের কাছে নয়নের মণি হয়ে রইলেন।

প্রমিথিউসের বন্ধন ও মুক্তি

মাউন্ট অলিমপাস গ্রীসের এক সুপ্রাচীন পর্বত। মেঘ ছাড়িয়ে আকাশ ফুঁড়ে উঠে গিয়েছে সেই পাহাড়। অলিম্পাসের শীর্ষদেশে ছিল এক অনিন্দ্যসুন্দর নগরী। সর্বক্ষণ আলোকজ্জ্বল থাকত এই নগরী সূর্যকিরণে। ঘণ্টা ও ঋতুরাজি অহর্নিশ পাহারায় থাকত এই নগরীতে। আকাশের বুকে অলিম্পাসের মেঘে ঢাকা চূড়ায়—শ্বেত পাথরের প্রাসাদে এই নগরীতে বাস করতেন যাঁরা, মানুষের অপার শ্রদ্ধা ও অসীম বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন তাঁরা, পৃথিবীর স্রষ্টা ও পালনকর্তা তাঁরাই।

এইখানেই দেবরাজ জুপিটার ও তার স্ত্রী দেবতাদের রাণী, জুনো বাস করতেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে সূর্যদেবতা ও দেবী চন্দ্রা তাঁদের সঙ্গেই থাকতেন। দেবরাজ জুপিটারের সভাসদ্‌দের মধ্যে প্রমিথিউসের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। সকল দেবদেবীদের মধ্যে একমাত্র প্রমিথিউসই জুপিটারের অন্ধ অনুরক্ত ছিলেন না। জুপিটারের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়েই মনোমালিন্য হত। অলিম্পাসের ঊর্ধ্বজগতের চেয়েও নীচে পৃথিবীর সম্পর্কে উৎসাহ ছিল তাঁর বেশি।

প্রমিথিউস ক্রমশ পৃথিবীতে খালবিল নদীনালা গাছপালা সৃষ্টি করে প্রাণীদেহের উপযোগী আবহাওয়া সঞ্চার করে সূচনা করলেন পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনের। ওপর থেকে পৃথিবীর মানুষদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতে লাগলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তিনি দেখলেন গ্রীষ্মকালে মানুষের আর আনন্দ ধরে না। বড়রা চাষবাস, শিকার করে বেড়ায় মহা-আনন্দে আর ছোটরা ঘরে বাইরে হেসেখেলে মত্ত থাকে, কিন্তু শীতকালে দেখলেন নিদারুণ কষ্ট মানুষের। কনকনে শীতের মধ্যে, বরফঝরা শীতের দিনে মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। গ্রীষ্মের দিনে যে বাচ্চারা হাস্যোজ্জ্বল ছিল, তারা আজ শীতের দিনে নিস্তেজ, পাংশুটে, জুবুথুবু হয়ে পড়ে আছে ঘরের মধ্যে, বড়রা ঠাণ্ডার ভয়ে ঘরের বাইরে কাজে বেরোচ্ছে না—সব দেখে মনে হল প্রমিথিউসের, পৃথিবী যেন এক মৃতপুরীর রূপ নিয়েছে।

অলিম্পাসের মাথায় যেখানে দেবদেবীরা বাস করতেন সেখানে শীতের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীর লোকদের যে প্রমিথিউস নিয়ে আসবেন অলিম্পাসের মাথায় তারও উপায় ছিল না। কেননা, অলিম্পাসের শীর্ষদেশে দেবদেবীরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আবার আকাশের বুকে মেঘরাশির মধ্যে এত অসংখ্য মানুষকে আশ্রয় দেওয়াও সম্ভব না, ভাবলেন প্রমিথিউস। কর্মকার দেবতা ভালকানের কথা হঠাৎ মনে হল তার। মনস্থ করলেন তিনি, ভালকানের কাছেই যাবেন তিনি আগুনের সন্ধানে। ভালকান পৃথিবীর মাটির গভীর অন্তস্তলে তার কামারশালায় দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলেছেন। দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম তেরি করার কাজে নিযুক্ত তিনি, প্রমিথিউস জানেন। আগুনে উত্তপ্ত না হলে লোহা পিটিয়ে এইসব জিনিস তৈরি করা যায় না। তিনি ভাবলেন যদি ভালকানের কাছ থেকে কোন কিছুতে আগুন ধরিয়ে সেটা পৃথিবীর মানুষদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তাই থেকে দিকে দিকে আগুনের ব্যবহার জেনে পৃথিবীর লোকেরা শীতকালে সোয়াস্তি পাবে এবং রান্নাবান্নার পদ্ধতি শিখে গরম গরম সুস্বাদু খাবার খেতে পারবে।

প্রমিথিউস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন পৃথিবীতে আগুন নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর মানুষদের আগুনের ব্যবহার শেখাবেন।

একদিন দেবতাদের সকলের অগোচরে ভালকানের কামারশালার উদ্দেশে প্রমিথিউস রওনা হলেন। পৃথিবীর বুকে সমুদ্রের তলদেশে গভীর এক গুহার ভিতর দিয়ে যেতে হল তাকে ভালকানের কামারশালায়। ঠাণ্ডায় জমাট গুহার নিকষ অন্ধকারে শ্যাওলাজমা সংকীর্ণ সোপানশ্রেণীর স্তর অতিক্রম করে শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন তিনি। সামনেই দেখলেন আলোকিত এক ওক কাঠের কুঠুরী, হাতুড়ী পেটার আওয়াজ আসছে সেখান থেকে।

কুঠুরীর দরজা খোলাই ছিল। দরজার বাইরে থেকে দেখলেন দেবতা ভালকান একহাতে জ্বলন্ত লোহার একটা টুকরোকে ঝনঝন করে পিটিয়ে যাচ্ছেন আর এক হাতে হাপরে হাওয়া দিচ্ছেন।

প্রমিথিউস দরজায় ঘা দিলেন। ভালকান মহাশ্চর্য হয়ে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ওখানে, কি চাই।' প্রমিথিউস বললেন, 'আমি প্রমিথিউস। ভেতরে আসতে পারি কি?' ভালকান সঙ্গে সঙ্গে উঠে প্রমিথিউসকে স্বাগত জানালেন। কি উদ্দেশ্যে তার আগমন জানতে চাইলেন। প্রমিথিউস বললেন, 'পৃথিবীর মানুষেরা ঠাণ্ডায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাচ্ছে তাদের শরীর। ঠাণ্ডা থেকে তাঁদের বাঁচাবার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাই আপনার কাছে এসেছি একটু আগুনের সন্ধানে; যদিও আমি জানি, দেবতারা মানুষকে আগুনের সন্ধান দেবেন না।'

ভালকান এবিষয়ে প্রমিথিউসকে সাহায্য করতে অসমর্থ বলে নিজের কাজে মন দিলেন। একটি রক্তলাল লোহার টুকরোকে পিটিয়ে পিটিয়ে তরোয়ালের আকৃতিতে আনছিলেন ভালকান একমনে। সেই সুযোগে প্রমিথিউস একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে চুল্লীতে জ্বালিয়ে সেই জ্বলন্ত কাঠের টুকরোটি নিয়ে নিঃশব্দে কুঠুরী থেকে বেরিয়ে দুরন্ত গতিতে সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে মাটি ফুঁড়ে সমুদ্র ভেদ করে উঠে এসে পৃথিবীতে উপস্থিত হলেন।
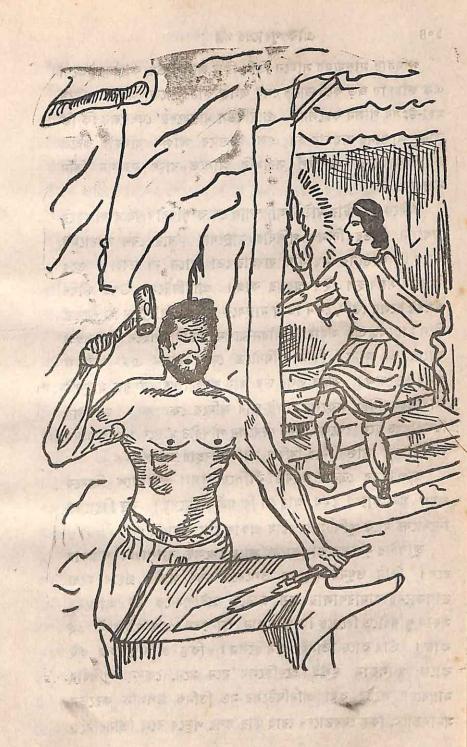
পৃথিবার মানুষদের সামনে তিনি কিছু লতাপাতা, কাঠের টুকরো এক জায়গায় জড় করে তাতে সেই জ্বলন্ত কাঠ থেকে আগুন ধরিয়ে মহা-উৎসব পালন করলেন। প্রমিথিউস মানুষদের দেখালেন কি কি কাজে আগুনের ব্যবহার হয় এবং কিভাবে আগুন ব্যবহার করতে হয়; আগুনের সংস্পর্শে সরাসরি আসতে বারণ করলেন তিনি মানুষদের।

এদিকে জুপিটার মাউণ্ট অলিম্পাস থেকে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন শীতের দিনেও পৃথিবীর মানুষেরা এবার বেশ আরামেই আছে। আগুনের সন্ধান বা ব্যবহার তো জানে না তারা! তবে কিভাবে সম্ভব হল এই বিস্ময়কর কাজ। প্রমিথিউসের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন তিনি, কেন তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। শীতের দিনে মানুষের এই অনায়াস জীবন-যাপন করার পিছনে কি রহস্য আছে, তা জানতে তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন এক পক্ককেশ বৃদ্ধের ছদ্মবেশে। যষ্টির ওপর ভর দিয়ে শশ্রুমণ্ডিত এই বৃদ্ধ মানুষটি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সঙ্গেই ভাব জমিয়ে ফেললেন। জুপিটার বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন পৃথিবীর মানুষেরা দেবতাদের অধিকারভুক্ত আগুন নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে।

জুপিটারের ক্রোধ স্বর্গমর্ত কাঁপিয়ে তুলল—আকাশে নিমেষে জমল ঘন কালো মেঘ আর সে কি গর্জন মেঘের! বজ্র বিদ্যুতের নির্ঘোষের মাঝে জুপিটারের রোষ প্রকাশ পেতে লাগল।

জুপিটার বুঝলেন ভালকানের কাছে গেলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। তিনি তখুনই সমুদ্রের তলদেশে সেই গভীর গুহার মধ্যে ভালকানের কামারশালায় এসে জানতে চাইলেন কে এই আগুনের সন্ধান পৃথিবীতে দিয়েছে। ভালকান জানতেন প্রমিথিউসেরই এই কাজ। তাঁর কাছে তিনিই এসেছিলেন। কিন্তু প্রমিথিউসের এই কাজে ভালকান খুশীই হয়েছিলেন মনে মনে, কেননা পৃথিবীর মানুষদের কষ্টের কথা প্রমিথিউসের মত তিনিও উপলব্ধি করতেন সমানভাবে, কিন্তু দেবতাদের রোষ তাঁর ওপর পড়বে বলে তিনি নিজে

পৃথিবীর মানুষদের আগুনের সন্ধান দেন নি। দেবরাজ জুপিটারকে ভালকান অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁর রোষ প্রশমনে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জুপিটার, জানতেই হবে তাঁকে কে আগুনের সন্ধান দিয়েছে পৃথিবীতে। তাঁর আদেশে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভালকানকে প্রমিথিউসের নাম করতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জুপিটার তাঁকে আদেশ দিলেন লোহার একটি বিরাট শৃঙ্খল তৈরি করতে এবং সেই শৃঙ্খলে প্রমিথিউসকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এক উঁচু পাথরের ওপর রেখে দিতে বললেন তাকে।

ভালকান নিজে এবং অন্যান্য দেবতারাও জুপিটারের কথা শুনে প্রমিথিউসের জন্য খুবই দুঃখ বোধ করলেন। কিন্তু দেবরাজের আদেশে ভালকানকে সেই শৃঙ্খল বানাতেই হল।

দেবরাজের আদেশে তাঁর অনুচরেরা প্রমিথিউসকে পৃথিবীর শেষ-প্রান্তে সেই বিরাট চাঙ্গড়ের ওপর নিয়ে এল। তাঁর হাত-পা শৃঙ্খলিত করে শৃঙ্খলটিকে পাথরের ওপর লোহার গোঁজ দিয়ে মেরে বসিয়ে দিল তারা। জুপিটারের একটি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির শকুন তখন প্রমিথিউসের উপর চক্কর দিয়ে বারে বারে তার যকৃৎ ছিঁড়ে খেতে লাগল। একের পর এক যকৃৎ সে ছিঁড়ে খায় জুপিটারের দেওয়া নির্দেশে আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন যকৃৎ গজিয়ে ওঠে জুপিটারের অঙ্গুলি-হেলনে। প্রমিথিউসকে অহরহ যন্ত্রণা দেওয়াই জুপিটারের উদ্দেশ্য ছিল।

ভালকান নিজেই এই দৃশ্য দেখে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছিলেন। তিনি দুইচোখ ঢেকে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। প্রমিথিউস দুর্মর প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন। অহরহ শকুনের এই ঠোকরানিতে অবিরাম তাঁর বুকে নিদারুণ যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও নিজের কৃতকর্মের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস হারান নি তিনি মুহূর্তের জন্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একদিন এক মহানায়ক আসবেন এখানে তাঁর উদ্ধারে। মানুষের মঙ্গলে তিনি যে কাজ করেছেন তার প্রতিফল তিনি একদিন পাবেনই—মুক্তি তাঁর হবেই।

পৃথিবীর মানুষেরা চারিদিক থেকে এসে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাল এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখল।

প্রমিথিউসকে যে বীর নায়ক উদ্ধার করেছিলেন তিনি হলেন অসমসাহসিক মহাবীর হারকিউলিস। হারকিউলিসের পিতা দেবরাজ জুপিটার, তাঁর মাতা এই পৃথিবীরই এক কন্যা। এই কারণেই তিনি মানুষের ক্ষমতার সঙ্গে বেশ কিছুটা দেবশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। হারকিউলিসের দেশ মাইসিনের রাজা ইউরিথিয়াসের আদেশে হেসপিরিদিসের বাগান থেকে সোনার আপেল আনার জন্য হারকিউলিস যখন হেসপিরিদিস নামে পরিচিত সেই কুমারী মেয়েদের সন্ধানে দুর্গম অভিযানে চলেছিলেন সেই সময় তিনি পৃথিবীর একপ্রান্তে এক দিব্যকান্তি পুরুষকে বিরাট এক পাথরের ওপরে শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলেন। এক হিংস্র শকুন বারে বারে তার বুক ঠোকরাচ্ছে আর সেই পুরুষটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। হারকিউলিস এই দৃশ্য দেখে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁর ধনুকে গুণ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শকুনটি ধরাশায়ী হল, প্রাণহীন দেহটা তার পড়ে রইল মাটিতে।

তারপর সেই উঁচু পাথরের উপর উঠে হারকিউলিস প্রমিথিউসের শৃঙ্খল ভেঙ্গে তাঁকে মুক্ত করলেন। মুক্ত হয়েই প্রমিথিউস হারকিউলিসকে বললেন, 'হারকিউলিস, আমি প্রমিথিউস, তোমার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করে বসেছিলাম।' হারকিউলিস অবাক হয়ে গেলেন কি করে তাঁর নাম জানল এই সৌম্যকান্তি পুরুষ। হার-কিউলিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যেতে দেখে প্রমিথিউস বললেন, 'আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, অনাগত ভবিষ্যৎকে আমি জানতে পারি। সেই ক্ষমতা বলেই জানতাম যে বীর-নায়ক হারকিউলিস একদিন আমাকে উদ্ধার করবে।' পৃথিবীর মানুষদের জন্য প্রমিথিউস যে দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন তা শুনে গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হারকিউলিস বিদায় নিলেন তাঁর কাছ থেকে।

প্যাণ্ডোরার বাক্স

দেবরাজ জুপিটারের চোখে আর ঘুম ছিল না। মানুষেরা দিনে দিনে যেভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে একদিন হয়ত তারা অলিমপাস দখল করে নিয়ে দেবতাদের উৎখাত করে নিজেরাই তাদের স্থানে নেবে, আশঙ্কা করলেন তিনি।

শেষে তিনি এক পরিকল্পনা রচনা করে স্বর্গের কর্মকার ভালকানকে আদেশ দিলেন একটি সুন্দরী মেয়েকে সৃষ্টি করতে। মেয়েটিকে যখন জুপিটারের কাছে আনা হল তখন অন্যান্য দেবতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেবতারা তাকে সৌন্দর্য, ভালবাসা ও সাহসের অধিষ্ঠাত্রী রমণীরূপে অভিষিক্ত করলেন এবং মেয়েটির নামকরণ করলেন তাঁরা প্যাণ্ডোরা।

প্যাণ্ডোরা রূপগুণ পেয়ে এবং জাগতিক বুদ্ধিবল লাভ করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মর্তের মানুষের মতই নানান বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। জুপিটার প্যাণ্ডোরার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করে ছোট একটি সোনার বাক্স তার হাতে দিয়ে বললেন, ওটি যেন সে কখনও না খোলে। বাক্সটির ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে বললেন, অন্য কেউ

যাতে এটা খুলতে না পারে সেজন্য তাকে সতত সজাগ দৃষ্টি রাখতে বললেন। জুপিটার এবার তাঁকে পৃথিবীর অভিমুখে ছায়াপথে নামিয়ে দিলেন। সেই পথে গা ভাসিয়ে পৃথিবীতে নেমে এল প্যাণ্ডোরা। বিশাল ব্যাপ্ত নক্ষত্রলোক পাড়ি দিয়ে মহানন্দে সে পৃথিবীতে পৌঁছে অভিভূত হয়ে পড়ল জীবনে প্রথম মানুষ দেখে। এটা লক্ষ্য করে তার খুবই আনন্দ হল যে পৃথিবীর মানুষেরা দেব-দেবীদের মত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। দেবদেবীদের চেয়ে মানুষদের সঙ্গেই মেলামেশা করা সহজ হবে তার পক্ষে, বুঝল প্যাণ্ডোরা।

প্যাণ্ডোরা যখন পৃথিবীতে এসে নামল, তখন মানুষেরা ভাবল বুঝি অলিমপাস থেকে কোন পরী এসেছে। তারা আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাল তাকে। তার হাতের সোনার বাক্সটির ব্যাপারে সকলেরই স্বাভাবিক কৌতূহল জাগল। ওর মধ্যে কি আছে জানতে চাইল তারা। তখন প্যাণ্ডোরা বলল, দেবরাজ জুপিটার তাকে এই বাক্স দিয়ে বলেছেন এটি যেন কখনও খোলা না হয়। তখন লোকেরা তাকে বলল, 'এর মধ্যে তাহলে ধনরত্ন থাকতে পারে। আমরা কেউই এতে হাত দেব না। একবার তুমি যদি বাক্সটি খুলে এক পলক দেখে নাও, তাহলেই তো জানা যাবে বাক্সটির মধ্যে কি আছে। তুমি তো আর বাক্সের ভিতরে হাত ঢোকাচ্ছ না। শুধু এক পলক দেখলে তো আর জুপিটার তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে না।' প্যাণ্ডোরা ভাবল, সত্যিই তো, সে তো কিছু নিচ্ছে না বাক্স থেকে, মুহূর্তের জন্য সে দেখে নেবে বাক্সটির মধ্যে কি আছে।

বাক্সটি যেই একটু খুলেছে সে, অমনি তা থেকে অসুস্থতা, লোভ, দ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, নীতিহীনতা, পাপ এবং এইরকম আরও কত কি বেরিয়ে চারিদিকে ঘর্ঘর আওয়াজ করতে লাগল। লোকেরা কানে হাত দিয়ে বসে পড়ল। বাক্সটিকে বন্ধ করতে বলল সকলে একসঙ্গে ; প্যাণ্ডোরা সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তার একটা আঙুল বাক্সটির ডালার নিচে আটকিয়ে গেল।

প্যাণ্ডোরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, কিছুতেই আঙ্গুলটাকে ছাড়িয়ে আনতে পারল না। এদিকে এইসব অবাঞ্ছিত বিষয়গুলো বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায় জুপিটার নিশ্চয়ই তার ওপর রুষ্ট হবেন—এই ভেবে তার মনে আতঙ্ক জাগল। সে যে জুপিটারের আদেশ অমান্য করে বাক্সের ডালা খুলেছে জুপিটার নিশ্চয়ই তা জেনে ফেলবেন। তখন তার কি পরিণতি হবে ভেবে আঁৎকে উঠল সে। আঙ্গুলটা আর একবার জোর করে খোলার চেষ্টা করতে বাক্সটা সামান্য একটু হাঁ হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল বাক্সের ভিতরে রয়েছে এক সুন্দরী পরী, হাতে তার চকচকে এক যাদুদণ্ড। এবারে আঙ্গুলটা টানতেই বেরিয়ে আসল এবং বাক্সটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। আঙ্গুলটা টেনে নিয়েই প্যাণ্ডোরা চিৎকার করে উঠল 'আরও একটা জিনিস আছে বাক্সের মধ্যে। এইমাত্র দেখলাম আমি।' লোকেরা সব চিৎকার করে উঠল—'কি আছে, আর কি আছে?' প্যাণ্ডোরা তখন তাদের সেই সুন্দরী পরীর কথা বলল। তা শুনে সকলে আগ্রহের আতিশয্যে তাকে বাক্সটি আবার খুলতে বলল। এবারে প্যাণ্ডোরা শক্ত হয়ে গেল, বলল, না, আর বাক্সটি খুলে চারিদিকে বিষের হাওয়া ছড়িয়ে দেবে না সে। ঐ সুন্দরী পরীই হয়ত বাইরে বেরিয়ে বিষ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে, বলল সে।

তখন বাক্সের ভিতর থেকে সেই সুন্দরী পরীর গলার আওয়াজ ভেসে এল, 'প্যাণ্ডোরা, আমাকে বাক্স থেকে বার করে দিও না। আমি সকলের বল-ভরসা। আমিই আশা, আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারে না কেউ। আমি আছি বলেই সকলের জীবনে গতি রয়েছে, নাহলে সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যেত। আমার অস্তিত্ব সর্বত্রই আছে। কিন্তু কেউই আমাকে দেখতে পায় না। আমার জন্যেই দিন গুণে গুণে জীবন-স্রোতে পাড়ি দেয় মানুষেরা। আমাকে ছেড়ে দিলে জীবনে তাদের অনীহা আসবে। তখন মানুষের জীবন ঘোর অন্ধকারময় হয়ে যাবে।'

পরীটির এই কথাগুলোই প্যাণ্ডোরা সকলকে আবার বলে শুনিয়ে

দিল এবং জনতার কাছ থেকে একটি শক্ত ছিলা নিয়ে বাক্সটি আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল, যাতে কেউ খুলতে না পারে।

'এরপর আর আমরা জীবনে আশা হারাব না।'—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্যাণ্ডোরা বলল এই কথা।

যদিও মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্যাণ্ডোরায় বাক্স থেকে জীবন-যন্ত্রণা-জ্বালা, অনেক অন্যায় অশান্তির বীজ বিস্তার লাভ করেছে তবুও মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় নি প্যাণ্ডোরর বাক্সে আশার চির অধিষ্ঠানে।

একশত চক্ষু আরগুস

প্রমিথিউস যখন পৃথিবীর এক প্রান্তে উঁচু এক পাথরের ওপর শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন তখন তার কাছে ভিড় করত অসংখ্য মানুষ কত। কেউ আসত কিভাবে এই সাহসী দেবতা শকুনের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে দেখতে আবার কেউ আসত তাঁর দর্শনলাভের জন্য এবং তার পরামর্শ-উপদেশ লাভ করতে।

একবার কয়েকজন জলপরী পক্ষযুক্ত সোনালী সবুজ রথে চড়ে সেই পাথরের কাছে উড়ে এল। তারা এসে প্রমিথিউসের জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করল; তাকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না তাদের। দিনের শেষে আঁধার নেমে এসে পৃথিবীকে গ্রাস করল যখন, জলপরীরা রথে উঠে উড়ে চলে গেল সাগরের তীরে কোন্ অজানা দ্বীপে।

আর একদিন ডানা মেলে উড়ন্ত এক ঘোড়া এক বৃদ্ধকে নিয়ে বাতাসের গতিতে এসে প্রমিথিউসের মাথার কিছুটা উঁচুতে কয়েকবার চক্কর দিয়ে মাথা নীচু করে ঘুরপাক খেয়ে প্রমিথিউসের সামনে এসে

দাঁড়াল। সমুদ্র-গুল্মের আচ্ছাদন গায়ে এই বৃদ্ধ হলেন সমুদ্রের রাজা ওসানাস।

রাজা ওসানাস বহুদূর থেকে এসেছিলেন প্রমিথিউসকে সাহায্য করতে। কিন্তু বুঝলেন প্রমিথিউসকে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। প্রমিথিউসও জানতেন ওসানাস কেন, কোনো রাজার পক্ষেই সম্ভব নয় তাকে উদ্ধার করা—একমাত্র সেই বীর শক্তিশালী হারকিউলিস ছাড়া কারোর পক্ষেই তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাজা ওসানাসের ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আকাশচারী ঘোড়াটির পিঠে উঠে মহাশূন্যে রূপালি পথ ধরে ফিরে গেলেন ওসানাস মহাসমুদ্রে।

বহু দেবতা, বহু মানুষ প্রমিথিউসের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু এক ভ্রাম্যমান গরু তার মনে সবচেয়ে দাগ কেটেছিল। ধবধবে সাদা গরুটির সজল বাদামী চোখ দুটো অভিভূত করে তুলেছিল তাকে। প্রমিথিউসকে যে চাঙ্গড়ের উপর রাখা হয়েছিল তার লাগোয়া প্রান্তরে গরুটি চড়ে বেড়াতে। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে উদ্বিগ্ন চোখে পেছনে ফিরে দেখত—তার পিছনে অনুসরণ করে তাকে সতর্ক পাহারায় রাখত এক দৈত্য, বাঘের চামড়া তার গায়ে, হাতে তার মেষপালেকের লাঠি। একশত চোখ তার—সারা শরীরে গাঁথা এই একশত চোখ।

দেবতাদের রাণী জুনো এই শতচক্ষু আরগুসকে পাঠিয়েছিলেন চব্বিশ ঘণ্টা এই গরুটির উপর নজর রাখতে। আরগুস অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিল। তার যখন ঘুমোবার দরকার হত, তখন সে দুটি চোখ বুজে ঘুমোত—বাকি চোখগুলো মেলে রাখত সে গরুটির অতন্দ্র পাহারায়।

একদিন সেই শ্বেতশুভ্র গরুটির চোখ পাথরের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমিথিউসের উপর পড়ল, তার নজরে পড়ল, এক দুরন্ত শকুন প্রমিথিউসের বুকে অনবরত ঠোকরাচ্ছে। গরুটি হাম্বারব তুলে জিজ্ঞেস করল, কে এই মানুষ, যে এই অত্যাচার সহ্য করছে অসহায়ভাবে।

'হে আইও, মাঠে প্রান্তরে অবিরাম ঘুরে ঘুরে তুমি পথশ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—তবুও অন্তহীন তোমার চলা।'

আইও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষটির মুখ থেকে এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। প্রমিথিউসকে জিজ্ঞেস করল, কি করে জানল সে তার নাম? প্রমিথিউস নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি সর্বজ্ঞ, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিনি সব কিছুই জানেন। প্রমিথিউস জানতেন সুন্দরী রমণী আইও জুনোর অভিশাপে এক গরুতে পরিণত হয়েছে। দেবরাজ জুপিটার আইওর রূপের খুব প্রশংসা করেছিলেন একবার তাঁর স্ত্রী জুনোর কাছে। এর ফলে আইওর প্রতি রাণী জুনোর ঈর্ষা ও রোষ জন্মায়। জুনোর রোষ থেকে আইওকে বাঁচাবার জন্য জুপিটার তাকে একটি ধবল গরুতে পরিণত করে নিজের কাছে রেখে দেন। রাণী জুনোর সন্দেহ হয় আইওকেই জুপিটার গরুতে পরিণত করেছেন। তিনি জুপিটারের কাছে গরুটি দাবি করেন। কিন্তু সেটি দিতে রাজী হলেন না জুপিটার। তখন জুনো নিশ্চিত হলেন যে এই গরুই আইও। তখন তিনি স্বামীর কাছ থেকে জোর করে গরুটিকে নিয়ে নিলেন। জুনো তখন শতচক্ষু আরগুসকে গরুটির নজরদারির ভার দিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও আরগুস গরুটিকে তার চোখছাড়া করেন না। আইও গরুর শরীর নিয়ে মাঠে প্রান্তরে যেখানেই চড়ে বেড়াক না, আরগুস সবসময়েই তার পিছু নিত; এক মুহূর্তের জন্যও তার স্বাধীনতা ছিল না। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক না আইও, শতচক্ষু আরগুসের প্রহরায় থাকতে হত তাকে। আরগুসের সবুজ, কালো, লাল চোখ সবসময়েই যেন কটাক্ষ হানছে তার উপর—এই ভয়ঙ্কর মেষপালকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অহরহ আইওর প্রাণ ছটফট করত। সে প্রায়ই প্রমিথিউসকে জিজ্ঞেস করত, 'আচ্ছা, আমি কি বরাবরই গরুর শরীর নিয়ে আরগুসের কর্তৃত্বাধীনে থাকব। এই শতচক্ষু দৈত্য কি বরাবরই আমার পিছু নেবে?'

'আজ থেকে কয়েকশো বছর পর তোমাদের দেশে হারকিউলিস

নামে এক মহা শক্তিধর বীরপুরুষের আবির্ভাব হবে। সেই তোমাকে এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে। আমার উপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের অবসান হবে সেইদিন। তোমারও বিপদ কাটবে সেইদিনই।'

আইও তার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চার পা গুটিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। প্রমিথিসিউসকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে প্রমিথিউসের কাছাকাছি থাকা পছন্দ করল আইও। কিন্তু তাতেও কি শান্তি আছে! আরগুসও তার কাছাকাছি থেকে শতচক্ষুর তীক্ষ্ণ মহাব্যাপ্ত দৃষ্টি দিয়ে তার আত্মাকে দীর্ণ- বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

এদিকে অলিমপাসে দেবাধিপতি জুপিটার দেবদূত মারকারিকে ডেকে বললেন, 'আইওর এই দুর্বিসহ জীবন দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারছি না। শতচক্ষু দৈত্যকে হত্যা করা দুঃসাধ্য জেনেও আমি তোমাকে এই কাজের ভার দিলাম—ছলে বলে যেভাবেই হোক, তুমি তাকে নিধন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

মারকারি তার ডানাওলা পাদুকা পরে হাতে বাঁশি আর কোমরে তরোয়াল নিয়ে নিমেষে উড়ে গিয়ে প্রমিথিউসের কাছ থেকে অল্প দূরে যেখানে আইও বসেছিল সেখানে এসে বসে পড়লেন। কাছেই একটি ছোট মাটির ঢিবির ওপর বসে আরগুস আইওর পাহারায় ঠায় বসেছিল। মারকারি তার নলখাগড়ার বাঁশিটায় সুমধুর তান তুলে বাজাতে লাগলেন। মারকারির বাঁশির সুরেলা আওয়াজে আরগুস আবিষ্ট হয়ে গেল। সে ধারণা করতে পারল না যে স্বয়ং মারকারি বাঁশি বাজাচ্ছে। সেই বাঁশিবাদকটিকে আরগুস তার কাছে এসে বসতে বলল। মারকারি তার পায়ের সামনে বসে মায়াময় সুরজাল বিস্তার করে বাঁশি বাজাতে লাগলেন অবিশ্রাম। সেই বাঁশির সুরজালে যাদুসঞ্চারী মূর্ছনায় মোহাবিষ্ট হয়ে গেল আরগুস, একে একে তার সবকটি চোখ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বুজে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে বাঁশি থামিয়ে মারকারি গান গাইতে লাগল যুদ্ধের কথা নিয়ে, ড্রাগনের কথা নিয়ে, স্বর্গের দেবদেবীদের কথা নিয়ে। ইতিমধ্যে একে একে দৈত্যটির নিরানব্বইটি চোখই বুজে গেল। বাকি থাকল একটিমাত্র চোখ,

সেটি সতর্ক নজরে আইওকে লক্ষ্য করছিল। এবারে মারকারি গান গেয়ে উঠলেন এক জলপরীর কাহিনীকে অবলম্বন করে। গানের মধ্যে দিয়ে মারকারি বলে যেতে লাগলেন, এক অপূর্ব সুন্দরী জলপরীকে ভালবেসেছিল তার ছেলে প্যান। প্যানের হাত থেকে বাঁচার জন্য পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়ে নদীতীরে ছুটে গিয়েছিল সেই জলপরী। শ্বেতপাথরের বড় বড় চাঙড় আর উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বহে যাওয়া সেই নদীর কলকলধ্বনি আর গাছগাছালির ফিসফিসানি বর্ণনা করল মারকারি তার মোহমুগ্ধকর গানের মাধ্যমে। একগুচ্ছ নলখাগড়ার রূপ ধারণ করে সেই জলপুরী চিরতরে মুক্তি পেল প্যানের কাছ থেকে, গান গেয়ে জানাল মারকারি। নলখাগড়ায় বনে প্যানের দুঃখ ভরা প্রাণের দীর্ঘশ্বাস তার গানে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। দৈত্য আর-গুসের শেষ চোখটিও বুজে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল সে—অঘোর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন মারকারি। তিনি এবার কোমর থেকে তরোয়ালটি বার করে আরগুসের মাথাটি কেটে ফেললেন।

অবশেষে আইও সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পেল। এবারে সে স্বাধীনভাবে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে চড়ে বেড়াতে পারবে। প্রমিথিউসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পাড়ি দিল সে।

অলৌকিক কলস

একদিন দেবরাজ জুপিটার দেবদূত মারকারিকে নিয়ে অলিম্পাস থেকে মর্তে নেমে এলেন। পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। তাঁরা দুজনেই আলখাল্লা পরে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে পৃথিবীতে এসে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলে তারা এক গ্রামে ঢুকে পড়লেন। এই দুজন অপরিচিত মানুষকে দেখে রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ছেলেছোকরারা তাদের দেখে হৈ-হৈ করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। জুপিটার মারকারিকে বললেন, 'প্রথমেই যা সম্বর্ধনা পেলাম এখানে আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।' মারকারি শুনে বললেন, 'কুকুর আর বাচ্চাশিশুদের কোন বোধশক্তি নেই। ওদের কথা ছেড়ে দিন।'

হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা সুন্দর এক বাড়ীর সামনে এসে পড়লেন ; বাড়ীটার ভিতরের আলো বাইরে এসে পড়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা দুজনেই বেশ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। জুপিটার এবং মারকারি সেই বাড়ীর দরজায় টোকা মারলেন। বাড়ীর ধনী মালিকের

এক ভৃত্য এসে দরজা খুলল, বেশ জমকালো পোশাক তার গায়ে। মুখ বেঁকিয়ে অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে তাঁদের, 'কি চান আপনারা?' উত্তরে তারা বললেন, 'আমরা এই গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি। রাতে থাকা খাওয়ার জন্য একটা জায়গা চাই এখানে।' চাকরটি বলল, এখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না, তাছাড়া আজ তার মালিকের বাড়ীতে একটা উৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে; তাদের মতো লোকেদের এ বাড়ীতে এখন ঢোকানই চলবে না। মারকারি তখন বললেন, 'আমরা যদি রান্নাঘরেও জায়গা পাই তাহলে আমরা পাতের পরিত্যক্ত খাবারগুলো তো খেতে পারব।' মারকারির কথা শেষ হওয়ার আগেই ভৃত্যটি তাঁদের মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটি বন্ধ করে দিল। তাঁরা তখন আর সেখানে না দাঁড়িয়ে পরের বাড়ীটির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাদা মারবেল পাথরের বাড়ী এটি। বাড়ীর ভিতর থেকে গান-নাচ আর হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ আসছে। এই বাড়ী থেকেও তাদের গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হল।

বাড়ী বাড়ী ঘুরে, পথচারীদের কাছে অনুরোধ জানিয়েও তাঁরা সেই রাতের জন্য কোথাও আশ্রয় পেলেন না। কোন মানুষের কাছ থেকে তাঁরা একবিন্দু সহানুভূতি বা সহৃদয়তার পরিচয় পেলেন না। মারকারি জুপিটারকে খেদের সঙ্গে বললেন, পৃথিবীর এইসব পুরুষ ও নারীরা তাদের বাচ্চাদের মতোই বোধশক্তিহীন; যেসব বাচ্চারা তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ছিল তাদের সঙ্গে বড়দের তফাত নেই কোনো। জুপিটার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। জুপিটারের রক্তবর্ণ চোখ ও উত্তেজিত মুখ দেখে মারকারি আশঙ্কা করলেন পৃথিবী না বজ্রবিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে তাঁরা গ্রামের শেষপ্রান্তে এসে গেছেন। সেখানে একটি পাথুরে রাস্তা পেলেন। সেই রাস্তা ধরে তারা একটা ঢালু পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলেন; সেখানে এক কুটীরে আলো জ্বলছে দেখলেন। খড়ের ছাউনি দেওয়া বেড়ার কুটীরের খোলা জানলাটি একটা কম্বলের

টুকরো দিয়ে ঢাকা রয়েছে, লক্ষ্য করলেন তাঁরা। রান্নাঘরে চুল্লির নল থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। কুটীরটির সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথে আসামাত্র শুনতে পেলেন তাঁরা একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর; কুটীরের ভেতর থেকে তার কথা বাইরে বেরিয়ে আসছিল—'প্রিয়, আরামবোধ করছ তো বেশ।' তারপরই এক নারী কণ্ঠস্বর—'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, প্রিয়তম।' পুরুষটি বলল, 'আমার খুব ইচ্ছা ছিল গ্রাম থেকে তোমার জন্য শীতের আচ্ছাদন কিছু নিয়ে আসি, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের সম্পর্কে কিছু শুনতেই নারাজ। আমরা যে ভীষণ দুঃস্থ, আমাদের যে কম্বল কেনারও পয়সা নেই এ বিষয়ে মাথা ঘামাবেই বা কেন তারা? একটা কম্বলও তো অন্তত কেউ যদি ধার দিত! না. তা পাওয়া সম্ভব নয়।' তারপরেই দেবতা দুজন ঘরের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেন। তাঁরা এবার পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে গৃহস্বামীকে ডাকার জন্য দরজায় ঘা দিলেন।

কুটীরের দ্বার খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ন্যুব্জ বৃদ্ধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। জুপিটার তাকে বললেন যে আজকের রাতের জন্য তাঁরা আশ্রয়ের খোঁজে এসেছেন।

বৃদ্ধ লোকটি অত্যন্ত সহৃদয় সুরে তাদের ভিতরে আসতে বললেন। বৃদ্ধ তার ঘরে বসিয়ে বললেন তাঁদের, 'দেখুন, আমরা এখানে আপনাদের আন্তরিকভাবে যত্ন করব। চেষ্টা করব, যাতে আপনাদের কোন অসুবিধে না হয়। তবে আমরা খুবই গরীব। আপনাদের রুচিসম্মত খাবার হয়ত দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে আপনাদের সেবা করে ধন্য হব আমরা।'

বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'বোসিস, বোসিস, অতিথি এসেছেন আমাদের ঘরে। দু-দুজন অতিথি এসেছেন। দেখবে এস এখানে।' এক পক্ককেশ বৃদ্ধা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে এলেন। আগন্তুকদের তিনি স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'আমাদের আজ কি

সৌভাগ্য। আমাদের ঘর আজ আপনারা আলো করে এসেছেন। আপনারা আমাদের সম্মানীয় অতিথি আজ।'

তারপর বৃদ্ধ লোকটি অতিথি দুজনকে বললেন যে তার নাম ফিলিমন এবং তাঁর স্ত্রীর নাম বোসিস। তারা দুজনেই পাহাড়ের ওপর নিরালা এই জায়গায় থাকে। কুটীরের লাগোয়া নিজেদের বাগানে যে আনাজ শাক ডাটা জন্মায় তাই তারা রান্না করে খায়। ফিলিমন আরও বলল যে তারা দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছে, কানে এখন কম শোনে সে, জোরে কথা না বললে শুনতে পায় না। অবশ্য তার স্ত্রী বোসিসের কানের অবস্থা ভালই আছে। বোসিস চোখে বেশ কম দেখছে আজকাল। তার নিজের দৃষ্টিশক্তি মোটামুটি এখন পর্যন্ত ভালই আছে। একজনের দৃষ্টিশক্তি এবং এবং অন্যজনের শ্রবণশক্তি ভাল থাকায় তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ভালভাবেই কাটছে। অতিথির ছদ্মবেশে ঐ দুজন দেবতা তার কথা বেশ মনোযোগের সঙ্গেই শুনলেন।

এই ফাঁকে বোসিস রান্নাঘরে ঢুকে তাদেরই বাগান থেকে তোলা কিছু শাকপাতা সেদ্ধ করলেন। তাদের পোষা মুরগীটির দুটি ডিম ঘরে ছিল। ডিম দুটি আধসিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে রাখলেন। ঘরে একটু পনির ছিল সেটি যত্ন করে একটি পাত্রে রাখলেন। একটি কানা উঁচু পাত্রে ঘরে বানানো কিছু সুরা ঢেলে রাখলেন।

তারপর টেবিলে একে একে খাবারের পাত্রগুলি রেখে দুই অতিথিকে খেতে বসতে বললেন। জরাজীর্ণ টেবিলের লাগোয়া নড়বড়ে একটি বেঞ্চির উপর অতিথি দুজন বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই বসলেন। অতিথিরা লক্ষ্য করলেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এত দৈন্য অবস্থা, কিন্তু অকৃত্রিম হৃদয়ে তাঁদের অপ্যায়ন করছে তারা যথাসাধ্যভাবে। অভিভূত না হয়ে পারলেন না ছদ্মবেশী এই দুই দেবতা।

টেবিলের ওপর সাজানো খাবারের দিকে তাকিয়ে জুপিটার ও মারকারি লক্ষ্য করলেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ঘরে যা কিছু ছিল সবই নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। ফিলিমন ও বোসিস তাঁদের সামনে

দাঁড়িয়ে সলজ্জ হয়ে বলল, দরিদ্রের কুটীরে এই সামান্য ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাঁরা যেন তাদের দোষত্রুটি মার্জনা করে দেন। ছদ্মবেশী দেবতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন, এ-তো বিরাট আয়োজন। এর চেয়ে ভাল আয়োজন আর কিছু হতে পারে না। এর থেকে বেশি পরিতৃপ্তি আর কোন ভোজ-অনুষ্ঠানে লাভ করা যাবে না।

খাওয়ার শেষে ফিলিমন সুরার গামলা থেকে দুজনের পাত্রে সুরা ঢালছিলেন। দুজনে এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করে আবার পাত্র ধরছিলেন। ফিলিমন প্রমাদ গুণলেন, গামলার সুরা তো এইবার শেষ হয়ে যাবে। বারে বারে তো পাত্র ভর্তি করা যাবে না। ঘরে আর এক ফোঁটাও সুরা নেই। কিভাবে অতিথিদের সন্তুষ্ট করবেন তিনি ভেবে কুল পেলেন না। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ফিলিমন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, গামলা থেকে সুরা ঢালতে ঢালতে নিঃশেষ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গামলাটির ভিতরে যেন মহাসমুদ্রের অধিষ্ঠান হয়েছে। সেটির ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন তার তলা থেকে সুগন্ধী রক্তবর্ণ সুরা ফিনকি দিয়ে উঠছে। মহা বিস্ময়ে অতিথিদের দিকে বিস্ফারিত চোখে তিনি চাইলেন। দেখলেন অতিথি দুজন মিটিমিটি হাসছেন। ফিলিমন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল স্বয়ং ভগবান তাঁদের ঘরে অতিথি হয়ে এসেছেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, 'বোসিস ছাখ, ছাখ, স্বয়ং ভগবান আমাদের এই দীনের কুটীরে উপস্থিত। আজ আমাদের কি আনন্দের দিন!' ফিলিমন ও বোসিস মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেবতা দুজনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে অন্তরের ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানালেন তাঁদের।

ফিলিমন দুই দেবতাকে বললেন, 'হে ঈশ্বর আমাদের দুজনকে ক্ষমা করুন। দেবতাদের পক্ষে নিরতিশয় অনুপযুক্ত আশ্রয় ও খাবার আমরা দিয়েছি আপনাদের। আমাদের লজ্জা আর বিবেক-দংশনের শেষ নেই। আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।'

দেবরাজ জুপিটার তখন তাঁদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমরা

জানি তুমি তোমার সর্বস্ব দিয়ে সেবা করেছ আমাদের। যে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ তোমাদের এই কাজে পেয়েছি তা নজিরবিহীন। পৃথিবীর মানুষেরা তোমাদের কাছে নগণ্য। তাদের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি আর তোমার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি বা পাচ্ছি তাতে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত। তোমাদের সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও তোমরা আমাদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করেছ আর তাদের যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের অবাঞ্ছিত মনে করেছে। তারা হীন ও স্বার্থসর্বস্ব। আমরা তোমাদের এই অতুলনীয় আতিথেয়তার জন্য পুরস্কৃত করব।

কিন্তু ফিলিমন সেকথা না শুনে দেবতাদের খাওয়ার অযত্ন হয়েছে দেখে তাদের পোষা মুরগীটাকে ধরতে গেল, ইচ্ছা ছিল সেটাকে কেটে দেবতাদের রান্না করে খাওয়ায়। কিন্তু দেবতা দুজন তাকে বাধা দিল এই কাজ করতে। বললেন, মাংস তাঁরা খাবেন না, তাঁদের পেট ভর্তি; তাছাড়া এই কুটীরে আশ্রিত এই পোষা জীবটিকে হত্যা করা সঙ্গত হবে না।

পরদিন ভোরে ফিলিমন ও বোসিসকে নিয়ে জুপিটার ও মারকারি কুটীরটির আরও ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে নীচে উপত্যকাটির দিকে তাকিয়ে ফিলিমন ও বোসিস বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। নীচে দেখল তারা সেখানে আর কোন ঘরবাড়ী নেই, সমগ্র এলাকাটি একটি হ্রদে পরিণত হয়েছে—স্বচ্ছ আয়নার মত দেখাচ্ছে সেটাকে। সেই হ্রদের স্ফটিকস্বচ্ছ জলে সাদা মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে; চারিদিকে যতদূর তাদের নজর যায় কোথাও কোনো ঘরদোর দেখতে পেল না তারা—ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে সবকিছু, শুধুমাত্র ফিলিমনদের নিজেদের কুটীরটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে।

তারা যেন মোহপাশে রয়েছে। তাদের চোখের সামনে তাদের কুটীরটি ধীরে ধীরে এক মন্দিরে পরিণত হল। মন্দির-গাত্র খোদাই করা অলংকরণে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করল। দূর দূর থেকে

সারবন্দী পাখিরা এসে মন্দিরের ছাদের উপর বসে পড়ল। ফিলিমন ও বোসিস পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে বিমূঢ় হয়ে রইল।

দেবরাজ জুপিটার ফিলিমনকে বললেন, 'এই উপত্যকার দুষ্ট লেকেরা নির্মূল হয়ে গেল—উপযুক্ত শাস্তি পেল তারা। তোমরা এবার আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা কর বল, তোমাদের অভিলাষ জানতে উদ্‌গ্রীব আমরা।' ফিলিমন ও বোসিস একে অপরের মুখের দিকে চাইল। মুহূর্ত পরে ফিলিমন জুপিটারকে বলল, 'হে অলিম্পাসের মহান দেবতা, আপনাদের কাছে আমাদের দুজনের প্রার্থনা যেন আমরা দুজনে কখনই বিচ্ছিন্ন না হই। আমরা যেন বাকি জীবনটা একসঙ্গে বসবাস করতে পারি, অর্থাৎ কেউ যেন কারোর আগে পৃথিবী ছেড়ে না চলে যাই। আমাদের মধ্যে একজনের অবর্তমানে অন্যজনের বাঁচার ইচ্ছা এক মুহূর্তও নেই।'

অনেক বছর ধরে ফিলিমন ও বোসিস তাদের সেই মন্দিরকে রক্ষণাবেক্ষণ করল। খুব বৃদ্ধ হয়ে তারা যখন একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ল, তখন তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাইল। তারা পরস্পরের হাত ধরে মন্দিরের স্তম্ভের সামনে একদিন দাঁড়িয়ে পড়ল। চতুর্দিকের পাহাড়ের ঢলে সবুজের সমারোহের মাঝে স্থির হ্রদটীর স্ফটিকস্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত মেঘের ভেলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল তারা। বলাকা ধীরে ধীরে পাখা নেড়ে গোল হয়ে ভেসে চলল তাদের মাথার উপর দিয়ে, আকাশ বাতাস গুঞ্জরিত হল সার সার পাখির সুরেলা গানে। এই আদর্শবান দম্পতিকে শুভকামনা জানিয়ে গান গেয়ে উঠল তারা। হঠাৎ বোসিস সবিস্ময়ে দেখল ফিলিমনের মাথা রাশি রাশি পাতাতে পরিণত হয়েছে; নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল তা গাছের শাখাপ্রশাখাতে পরিণত হয়েছে। উপলব্ধি হল তাদের, নশ্বর জীবন ছেড়ে অনশ্বর জীবনে প্রবেশ করছে তারা। তারা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে তাদের আতিথেয়তার

জন্য যে পুরস্কার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন দেবতারা, তা এতদিনে সত্যে পরিণত হল।

পাহাড়ের ওপরে মন্দিরটির সামনে একই গুঁড়ি থেকে এক ওক বৃক্ষ এবং এক জম্বীরবৃক্ষ পাশাপাশি উঠে অনন্তকাল ধরে জুপিটারের স্মৃতি এই মন্দিরকে আগলে রেখেছে বুকে ধরে।

বন্যা

এত অশুভশক্তি প্যাণ্ডোরার বাক্স থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীতে যে তার ফলে মানুষেরা পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ হানাহানিতে মত্ত হয়ে পড়ে। অশুভশক্তি তাদের মানবিক অনুভব-অনুভূতিকে নষ্ট করে দেয়, এতটা দুঃসাহসী হয়ে পড়ে যে তারা জুপিটারকে পর্যন্ত গালমন্দ করতে ইতস্তত করল না।

জুপিটারের ক্রোধ তখন চরম সীমায় পৌঁছোল। তিনি পৃথিবীতে মুহুর্মুহু বজ্রবিদ্যুৎ হানতে লাগলেন। পৃথিবীর মাথায় ঘন কালো মেঘ বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীকে অতল আঁধারে নিমজ্জিত করল। পৃথিবীকে গ্রাস করল মেঘের ঘনঘটা, মেঘে মেঘে ঘর্ষণে গর্জে ওঠা গুরুগম্ভীর নির্ঘোষ আর বজ্রবিদ্যুতের বিরামহীন অগ্নিঝরা ঝিলিকের ভয়ঙ্করতায় শেষদিন ঘনিয়ে এল পৃথিবীতে।

ভালকানের কামারশালা থেকে হাপরের আগুনের হলকা উঠল আকাশের বুকে। রাশি রাশি ছুটন্ত কালো মেঘের কুণ্ডলীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের লেলিহান শিখা। তারপরে এল পৃথিবীর বুকে মহাকালের ঝড়ঝঞ্ঝা—গাছপালা বাড়ী-ঘরদোর ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ল

মাটিতে। ঝড়ঝঞ্ঝার সাথে পাল্লা দিতে এল প্রলয়বৃষ্টি—ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টির প্রলয় নাচনে পৃথিবী বুঝি সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হয়ে যায়। বৃষ্টির অবিরাম তুমুল ধারায় সমুদ্র নদীনালা ফুলে ফেঁপে উঠে পৃথিবীর ডাঙ্গা জমি সব ভাসিয়ে দিয়ে গ্রাস করে ফেলল প্রায় গোটা পৃথিবীকে।

দিউকালিয়ন ও পির্‌রা—এই দুটি তরুণ-তরুণী ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মানুষ জীবিত রইল না। দিগন্তব্যাপী বন্যায় ভেসে যায় পৃথিবী—মহাপ্লাবনে ডুবন্ত পৃথিবীর বুকে শুধু জেগে রইল পারনাস্সুস পাহাড়, সেই পাহাড়ের উপর উঠে এল সেই দুটি নর-নারী—দিউকালিয়ন ও পির্‌রা। জুপিটারের আশীর্বাদেই এরা দুজন অক্ষত অবস্থায় জীবিত ছিলেন। তারা দুজনে পাহাড়ের ওপরে পাশাপাশি বসে রইল। নীচে তাকিয়ে দেখল, কি প্রমত্ত উত্তাল জলোচ্ছাস পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—দিকে দিকে সুবিশাল ফেনিল ঢেউ পৃথিবীর উপর আছড়িয়ে গর্জন করে চলেছে—মহাপ্লাবনের এই ভয়াল দৃশ্য দেখছিল তারা পাহাড় থেকে নিথর হয়ে। অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের গর্জন আর বৃষ্টির গুরুগম্ভীর আওয়াজের মাঝে পৃথিবীর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করছিল তারা অসহায়ভাবে।

দীর্ঘদিন পর থামল বৃষ্টি ধীরে ধীরে। মেঘ মিলিয়ে গেল ক্রমশ আকাশ থেকে। জল সরে যেতে লাগল পৃথিবীর বুক থেকে—সমুদ্র নদীনালা আবার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পেতে লাগল। দীর্ঘদিন অজ্ঞাতবাসের পর সূর্য উঁকি দিল আকাশে। ঝলমলে উজ্জ্বল দিন এল আবার পৃথিবীতে—মহাকালের শীতল হাত থেকে মুক্তি হল অবশেষে পৃথিবীর। পৃথিবী এখন আবার সতেজ সবুজ।

পারনাস্সুস পাহাড়ের উপর বসে দিউকালিয়ন ও পিররা এই দৃশ্যান্তর দেখে উচ্ছাসভরে পরস্পরকে বলল, পৃথিবী কি সুন্দর! নীচে একদৃষ্টিতে চেয়ে পৃথিবীর রূপ যেন নতুন করে আবিষ্কার করল তারা দুজনে। দিউকালিয়ন ভারাক্রান্ত গলায় বলল—'আমরা দুজন ছাড়া কোন মানুষই আর বেঁচে নেই—প্লাবনে ডুবে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে পৃথিবীর সব মানুষ।' পির্‌রা সেকথা শুনে বললে, 'আমার মনে হয়

তারা সবাই সম্ভবত মানুষ হিসাবে ভাল ছিল না। উত্তরে দিউকালিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তা হয়ত ঠিক। কিন্তু ভীষণ একাকীত্ব বোধ করব আমরা।' পির্রা তখন বলল, 'আমাদের একাকীত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এস আমরা দৈববাণীর অনুগ্রহ লাভে প্রার্থনা :করি।' তখন তারা উর্ধ্বাকাশে হাত তুলে মঙ্গলময় দৈববাণীর জন্য একাগ্রমনে প্রার্থনা জানাল। তাদের প্রার্থনায় সাড়া এল। দৈববাণী শোনা গেল, 'তোমাদের মায়ের অস্থি ফেলে দাও সমুদ্রে। সুফল পাবে তোমরা।'

এ কি করে সম্ভব! হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে পড়ল তারা—তাদের মায়েরা গত হয়েছেন অনেকদিন। তাদের অস্থি মাটির তলা থেকে খুঁড়ে তোলা তো ঘৃণ্য পাপের সামিল হবে। তাহলে করার কী! দুজনেই চিন্তা করতে লাগল মায়ের অস্থি তুলে আনার মধ্যে কি তাৎপর্য আছে। হঠাৎ দিউকালিয়নের মাথায় চিন্তা খেলে গেল, মা তো ধরিত্রী, ধরিত্রীর অস্থি তো পাথর। তখনই তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে পাহাড়ের ওপর থেকে সতর্ক পায়ে নীচে নেমে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়াল। বন্যার তোড়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ভেসে আসা স্তূপাকার বালির মধ্যে সাদা গোলাপী কত পাথরের নুড়ি পড়ে রয়েছে দেখল তারা। দিউকালিয়ন সাদা একটা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে সমুদ্রের পাড় থেকে ছুঁড়ে দিল সমুদ্রের বুকে। অমনি এক সুপুরুষ জল থেকে উঠে এসে দিউকালিয়নকে আলিঙ্গন করল। তারপর একটি গোলাপী নুড়ি নিয়ে সমুদ্রের পাড় থেকে জলে ছুঁড়ে দিল পির্রা। অপরূপ সুন্দরী মহিলা এক, জল থেকে উঠে পির্রার কাছে চলে এল। এইভাবে দুজনেই বালুতট থেকে নুড়ি কুড়িয়ে জলে ছুঁড়তে লাগল। কতশত নরনারীকে বুকে ধারণ করে উচ্ছলিত হল পৃথিবী আবার। এই অপাপবিদ্ধ মানুষেরা ফিরিয়ে আনল নির্মল সুখশান্তি পৃথিবীতে।

মারকারির দুষ্টুমি

সুপ্রাচীন সময়ে প্রমিথিউসকে যখন শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা হয়েছিল তারও আগে একদিন সমুদ্রের দিগন্তরেখা থেকে উঠে এসে সূর্যদেবতা এ্যাপোলো তাঁর রশ্মির ছটা সমুদ্রের পরপারে এক কালো গহন গহ্বরের ভিতরে তির্যকভাবে ফেললেন সদ্যভূমিষ্ঠ দিব্যকান্তি এক শিশুর মুখকমলে—সোনাঝরা আলোয় উদ্ভাসিত হল নরজাতকের মুখশশী।

নিঃসীম আঁধারে সহসা আলোর ঝরনাধারায় খুশীতে শিশুটি হাত-পা ছুঁড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। সে তার ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে ধরতে গেল সূর্যের কিরণ ছটা। সূর্যদেবতা অবশ্য জানতেন না যে এই তাঁর ছোটভাই মারকারি, যে একদিন দেবতাদের দূত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লোভ করবে।

মারকারির পিতা দেবরাজ জুপিটার, মার নাম তার মাইয়া—সুন্দরী এক জলপরী সমুদ্রেই যার বাস।

সূর্যদেবতা তার আলোকছটাকে গুহায় বদ্ধ না রেখে এবারে আরও ওপরে তুলে ধরলেন—আকাশের অনেক উঁচুতে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর

কিরণমালা। দেবশিশু মারকারি স্বভাবতই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে, মানুষের বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যখ্যা দেওয়া যায় না। নবজাত মারকারি উঠে বসল তার দোলনায়—নবজাত দেবশিশুর কাছে এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। চারিদিকে চোখ ঘোরাল সে। কোথায় গেল সেই আলোর দীপ্তি? মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন এবং গুহাটি অন্ধকার এবং ঠাণ্ডা হয়ে গেল আবার। গুহার বাইরে থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের গুরুগুরু আওয়াজ আসছিল, গাঙ্গচিলের কর্কশ আওয়াজ আসছিল তার কানে।

মাকে ঘুমোতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে শিশুটি তার দোলনা থেকে বেরিয়ে এসে সন্তর্পাণ গুটি গুটি পা ফেলে গুহার মুখে বেরিয়ে এল।

গুহার বাইরে এসে সূর্যের প্রখর কিরণে তার চোখ বুজে এল। বাইরে ফুরফুরে বাতাস ছিল বলে তার শরীরে কোন কষ্টই হল না; বাইরের জগতের আলো-বাতাসের মাঝে এসে আনন্দে লাফিয়ে উঠল মারকারি। একটা ঢেউ এসে ছলাৎ করে তটে ভেঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে মারকারির পায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ে শ্যাওলা-ধরা পাথরে বাধা পেয়ে তরতর করে আবার গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে গেল মাটিতে। সমুদ্রের জলে ভিজে গিয়ে শিশু মারকারি পায়ে বেশ ঠাণ্ডা বোধ করল। জল থেকে পা বাঁচাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সে এক উঁচু পাথরের উপর উঠে পড়ল। পাথরটি হঠাৎ নড়ে উঠল। চলতে শুরু করল পাথরটি, সবিস্ময়ে দেখল মারকারি। কিছুটা ভয়ও পেয়ে গেল সে। পাথরটা ধরে সে তার ওপর শক্ত হয়ে বসে থাকল, পাছে সে পড়ে যায়। ধপধপ ওঠানামা করতে করতে পাথরটি চলল। হঠাৎ দেখতে পেল মারকারি, পাথরের সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে একটা লম্বাটে -মুখ নীচ থেকে উপরে উঠল। মারকারি বুঝল এবার, পাথর নয় তো এ, এটি একটি কচ্ছপ। কচ্ছপটি তাকে কর্কশ স্বরে বলল তার পিঠ থেকে নেমে যেতে। 'আমি আমার পিঠে বাচ্চাদের চড়া পছন্দ করি না।'

তখন মারকারির মনে একটা বুদ্ধি জাগল। দেবশিশুর অলোকিক ক্ষমতাই বটে। কচ্ছপের পিঠে হাত দিয়ে দেখল যে এটা বেশ মোলায়েম। তার পিঠে টোকা দিয়ে দেখল বেশ সুন্দর আওয়াজ হয় কচ্ছপের খোলসে। তখন বুড়ো কচ্ছপটাকে দেবশিশু তার ঐশীশক্তি বলে মেরে ফেলল। তারপর তার পিঠ থেকে খোলসটা খুলে নিয়ে সে তার গুহার মধ্যে চলে গেল। গুহায় ঢুকে তার দোলনা থেকে নটি শণের সুতো খুলে নিল। কচ্ছপের খোলসটিকে এই সুতো দিয়ে বাঁধল শক্ত করে। এবারে সুতোর তারের ওপর আঙ্গুল বুলোতে লাগল সজোরে। টুংটাং মধুর আওয়াজ বেরোতে লাগল সে সুতো দিয়ে। মারকারি তার এই নতুন ধরনের বীণাটি বাজাতে বাজাতে আনন্দ-উচ্ছাসে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল।

সমুদ্রতটের নরম সাদা বালি ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাতে নিরেট শক্ত হয়ে গিয়েছে। মারকারি তার ওপর দিয়ে দৌড়ে, ডিগবাজি খেয়ে নেচে কুঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বালুতটের ওপর দিয়ে অনেকটা এই ভাবে চলার পর পিছন ফিরে দেখল বালির ওপর কত বিচিত্র ধরনের নকসা আঁকা রয়েছে—বালুবেলায় এ যে তারই পায়ের আর শরীরের বিচিত্র সব দাগ। সেই গুহা আর তার মায়ের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। ধীরে ধীরে এক পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল সে, সমুদ্রের কোল থেকে উঠেছে পাহাড়টি। কি খেয়াল হল তার, পাহাড়টির ওপর ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। পশ্চিম আকাশে পাহাড়ের পেছনে সূর্য তখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। অপরদিকে রজতশুভ্র দেবী ডায়না (দেবী চন্দ্রা) আকাশে আরোহণ করছেন মন্থরবেগে। একদল গরুবাছুর মাঠে চড়ে বেড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিল। ঐ গরু-বাছুরগুলো আকারে অস্বাভাবিকভাবে বড়। তাদের মোলায়েম চকচকে শরীর জ্বলজ্বল করছিল চন্দ্রালোকে। মারকারি জানত ঐ গরুর পাল তার ভাই সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর। কিন্তু তাদের পাহারায় কেউই ছিল না। মারকারি ভাবল তার দাদা সূর্যদেবতা কি অসতর্ক, কারোর

ওপরেই এদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি তিনি। মার্কারির মাথায় তখন এক দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। সে ভাবল, কি মজা হবে, যদি মাঠ থেকে এই গরুর পালকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু তাদের পায়ের ক্ষুরের দাগ থেকে এ্যাপোলো ঠিক চিনে নিতে পারবেন কোথায় আছে তারা—মনে মনে এটাও চিন্তা করে নিল সে। তখন সে করল কি! কিছু খড়কুটো যোগাড় করে পায়ের তলায় বেঁধে নিল। এবারে সে ভাবল তার পায়ের চিহ্ন ধরতে পারবেন না এ্যাপোলো। গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙ্গে তাই দিয়ে গরু বাছুরগুলোকে তাড়িয়ে সামনের দিকে মুখ করিয়ে পিছন দিকে হাঁটাতে হাঁটাতে চারণভূমি অতিক্রম করে পাহাড়ের ঢল দিয়ে নীচের দিকে নিয়ে চলল তাদের।

এক বৃদ্ধ পথের পাশে একটা জাল সেলাই করছিল। একটি বাচ্চা ছেলে এতগুলো গরু-ষাঁড়কে পিছন দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এদৃশ্য দেখে সে তো তাজ্জব বনে গেল। মারকারি বৃদ্ধকে অনুরোধ করল, তিনি যা দেখলেন তা যেন কাউকে না বলেন। তাহলে তার নিজের ক্ষতি হয়ে যাবে। বৃদ্ধ লোকটি মাথা নাড়ল।

এবারে মারকারি গরুর পাল নিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথে এসে পড়ল—দুদিকে পাহাড় উঠে গেছে—সমুদ্রকে দৃষ্টির বাইরে রেখেছে একদিকের পাহাড়, অন্যদিক ঢেকে দিয়েছে চারণভূমিকে। মারকারি ঠিক করলেন দুটি গরুকে পিতা দেবরাজ জুপিটারের উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন তাঁর আশীর্বাদ লাভে। মারকারি দুটো গরুকে মেরে তাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করল। এ্যাপোলো যাতে তার এই কাজ বুঝতে না পারে, সেজন্যে মারকারি ছাইয়ের স্তূপকে চারিদিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

পরদিন এ্যাপোলো ভোরের আকাশে সূর্যরথ চালাবার সময় নীচে পাহাড়ের ওপর তাঁর গরুগুলোর চারণ ভূমির দিকে নজর দিয়ে দেখলেন সেখানে একটি গরুও নেই। তিনি বুঝলেন কেউ তাঁর গরুগুলোকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। দিনের শেষে রথ থেকে নেমে

সূর্যদেবতা এ্যাপোলো পাহাড়ের ওপর যে চারণ ভূমিতে গরুগুলো রাখা ছিল সেখানে এসে হাজির হলেন। চারিদিকে কোথাও তাঁর গরুটিকে খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ তিনি মাটিতে গরুর পায়ের ক্ষুরের চিহ্ন দেখলেন, কোন অদ্ভুতদর্শন জন্তুর পায়ের ছাপ হবে বলে মনে করলেন। তিনি ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢল দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। সেই বৃদ্ধটি সেখানে একই জায়গায় বসে জাল সেলাই করছিল। বৃদ্ধ লোকটিকে গরুটির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে সে এ্যাপোলোকে বলল যে সে এক মহা আশ্চর্যের ব্যাপার। একটি ছোট শিশুকে সেই বিরাট গরুর পালকে পিছন দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে সে। জুপিটার বুঝলেন এটা মারকারির কাজ। সেদিন সকালে তাঁর পিতা এ্যাপোলো তাঁকে মারকারির জন্মের খবর দিয়েছিলেন। আর তাছাড়া দেবতার পুত্র ভিন্ন আর কেই বা জন্মের একদিন পরেই এই অলৌকিক কাজ করতে পারে।

এ্যাপোলোর এখন নজর পড়ল সেই গুহায় যেখানে মারকারি ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সমুদ্রের উপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে গুহাটিতে পৌঁছে দেখলেন মারকারি ও তাঁর মাকে। এ্যাপোলো ভাইয়ের দোলনায় গিয়ে দেখলেন বালিশে কাত করে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নবজাতক মারকারি, তার হাতে মুঠো করে ধরা আছে কচ্ছপের খোলসে তৈরি একটি বীণা। মা তার পাশে ঘুমিয়ে আছেন। মারকারির ঘুম ভাঙ্গিয়ে এ্যাপোলো তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার গরুগুলোকে নিয়ে কি করেছ বল?'

'তোমার গরু, ষাঁড়—কি করে জানব তাদের কথা? গতকালই সবে জন্ম হয়েছে আমার!' মারকারি নির্বিকারভাবে বললেন।

এ্যাপোলো গর্জন করে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলছ, তুমি জান আমার গরুগুলো কোথায় আছে।" রাগত হয়ে তিনি মারকারিকে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলেন। মারকারি হেসেই অস্থির। জুপিটার তখন দড়ি দিয়ে মারকারির হাত দুটো শক্ত করে বাঁধতে

গেলেন। কিন্তু হাতের এক মোচড় দিয়ে জুপিটারের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে মারকারি এক ছুটে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে।

এ্যাপোলো তার পেছন পেছন ছুটে তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে পিতা জুপিটারের সামনে হাজির করলেন। গরু চুরী সম্পর্কে মারকারিকে দায়ী করে পিতার কাছে অভিযোগ তুললেন। জুপিটার সব কিছুই জানতেন—মনে মনে হাসলেন তিনি। মারকারিকে অবশ্য তিনি ধমকের সুরেই বললেন, তার একাজ করা ঠিক হয় নি। ঐ দুষ্কার্য করে আবার তা অস্বীকার করাটাও খুব অন্যায় হয়েছে। মারকারি মাথা হেঁট করে থাকল পিতার সামনে। এদিকে এ্যাপোলোর ক্রোধ প্রশমনে নিজের হাতের বীণায় তান তুলে গান গাইতে শুরু করল মারকারি। এ্যাপোলো গানের ভক্ত ছিলেন বিশেষ, জানত মারকারি। গানের শেষে মারকারিকে বললেন জুপিটার, বীণাটি তাকে দিয়ে দিতে। মারকারি তা দিতে অস্বীকার করলে এ্যাপোলো বললেন যে সে যদি তাকে ঐ বীণাটি দিয়ে দেয় এবং তার গরুগুলির সন্ধান দেয় তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। অনুতপ্ত হয়ে মারকারি এ্যাপোলোকে বীণাটি দিয়ে দিল এবং তার গরুগুলোকে পাহাড়ের ওপর যেখানে তিনি রেখে এসেছিলেন, সেখানে নিয়ে গেল এ্যাপোলোকে। এ্যাপোলো খুশী হয়ে মারকারিকে প্রতিশ্রুতিমত পুরস্কার দিলেন—তা হল এক যাদুদণ্ড আর এক জোড়া ডানা—সোনার সাপ পেঁচিয়ে রয়েছে তাতে।

ঐ যাদুদণ্ড বলেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন মারকারি আর পায়ে ঐ ডানা লাগিয়েই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মুহূর্তে উড়ে গিয়ে দেবতাদের দৌত্যকাজ নির্বাহ করতেন।

উড়ন্ত ঘোড়া

লিসিয়াতে বহুকাল আগে ছিল কিমেরা নামে এক দৈত্য যার মত ভয়ঙ্কর প্রাণী পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না। আবালবৃদ্ধবনিতা কত মানুষ যে তার হাতে প্রাণ দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। তার হাতে ছারখার হয়ে গিয়েছিল জনপদ কত। তার হুঙ্কার গর্জন শোনে নি এমন মানুষ কেউই ছিল না। আর যে মানুষই একবার চাক্ষুস তাকে দেখেছে, প্রাণ হাতে করে সে আর ফিরত পারে নি তার কাছ থেকে। যেসব সাহসী মানুষ ঢাল বর্শা সম্বল করে বাধা দিতে গিয়েছে তাকে, তারা কেউই রেহাই পায় নি কিমেরার হাতে।

লিসিয়ার রাজা আয়োবাটেস কিমেরাকে নিধন করার জন্য তার সৈন্যদের নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা ভয়ে পিছিয়ে এল। তারা তাদের অক্ষমতার জন্য যে কোন শাস্তি মাথায় পেতে নিতে রাজী আছে, জানাল তারা রাজাকে। রাজা বুঝলেন কিমেরার হাত থেকে প্রজাদের কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না।

লিসিয়ার মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে দিনের পর দিন। কিমেরার হাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল

না তাদের। এমন সময় একদিন এক অপরিচিত মানুষ রাজা আয়োবাটেসের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর রাজসভায় এল।

মানুষটি দীর্ঘদেহী এবং সৈন্যের পোশাক তার গায়ে। রাজাকে জানাল, তার নাম বেলেরোফোন। দূর এক রাজ্যে বসবাসকারী আয়োবাটেসের ছেলেই তাকে পাঠিয়েছে তাঁর কাছে। রাজার ছেলের লেখা একটি সীলকরা চিঠি সে রাজাকে দিল। রাজা চিঠিটা পড়ে অবাক হয়ে গেলেন—অসম সাহসিক সাধারণ ঘরের এই মানুষটির কাছে রাজপুত্র বেলেরেফোন খুবই নগণ্যবোধ করছেন ভিন রাজ্যে। এই লোকটিকে হত্যা করার জন্য সে পিতার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে চিঠিতে।

চিঠিটি পড়ে রাজা বেলেরোফোনকে বললেন, 'আমার ছেলে লিখেছে তুমি খুব সাহসী পুরুষ। তুমি কি দানব কিমেরার নাম শুনেছ? আমার রাজ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে সে! তুমি যদি এই দৈত্যটাকে বধ করতে পার, আমার রাজ্যে শান্তি ও আনন্দ ফিরে আসবে। প্রজারা জীবনের নিরাপত্তা ফিরে পাবে।'

রাজাকে হতবাক করে বেলেরোফোন বললেন, 'হ্যাঁ কিমেরাকে মারতে আমি প্রস্তুত।' একটু পরেই গম্ভীর হয়ে রাজা বললেন তাকে, 'যদি তুমি কিমেরাকে মারতে পার, তাহলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেব।' অবশ্য তিনি নিশ্চিত ছিলেন, কিমেরার হাত থেকে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না।

বেলেরোফোন রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিতে। সে জানত দেবতাদের সাহায্য ছাড়া কিমেরাকে বধ করা সম্ভব নয়। দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য সে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মন্দিরে দিনরাত প্রার্থনায় বসে থাকল। একদিন মন্দিরে দৈববাণী শুনতে পেল সে—পেগাসুস নামে এক ডানাওলা ঘোড়া সাহায্য করতে পারবে তাকে; পারসিউস যখন পরগন মেডুসার স্বর্ণময় মাথাটাকে কেটে ফেলে, তখন এই ঘোড়াটি মেডুসার রক্ত থেকে বেরিয়ে

আসে। বেলেরোফোনের কাছে দৈবাদেশ হল—'ডানাওলা ঘোড়াটায় উঠে পড়, কিমেরাকে তাহলে তুমি বধ করতে পারবে।'

বেলেরোফোন সেই বন্য ঘোড়া কিমেরার কথা আগেই শুনেছিল। কিন্তু সে কোথায় থাকে, তার হদিশ সে জানে না। কেউ আজ পর্যন্ত তার পিঠে চড়েছে বলেও সে জানে না। ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মন্দিরেই সে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকল। দিন গড়িয়ে রাত নেমে এল। গভীর রাতে মন্দিরের চত্বরে শুয়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনছিল বেলেরোফোন আর চিন্তা করছিল সেই ডানাওলা পেগাসুসের কথা। ক্রমশ চোখ জড়িয়ে এল তার। হঠাৎ এক তীব্র আলোর ঝলকানি খেলে গেল মন্দিরের চত্বরে। বেলেরোফোন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, তার সামনে আর্বিভূতা হয়েছেন জ্যোর্তিময়ী এক দেবী। ধূসর চোখ তাঁর, মাথায় সোনালী চুল, হাতে ঘোড়ার লাগাম। বেলেরোফোন বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। দেবী বললেন, 'বেলেরোফোন, আমি মিনার্ভা।' তাঁর কণ্ঠস্বর এক স্বর্গীয় মূর্ছনার সঞ্চার করল মন্দিরে। 'তুমি বন্য অশ্ব পেগাসুসের পিঠে আরোহণ কর। এই যাদু লাগামাটি ধর এবং আমার সঙ্গে এস।' মিনার্ভা অন্ধকার মাঠ দিয়ে হু হু করে এগিয়ে চললেন। পিছনে পিছনে বেলেরোফোন তাঁকে উধ্বর্শ্বাসে অনুসরণ করে চলল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে মিনার্ভা দাঁড়িয়ে পড়ে বেলেরোফোনকে বললেন, 'এইখানে অপেক্ষা কর।' তারপরেই মিনার্ভা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বেলেরোফোন দেখল সে এক জলা-ভূমির পাড়ে এসে পড়েছে। হঠাৎ জলাভূমির ওপরে চাঁদের আলোয় দেখল এক সাদা ঘোড়া ডানা মেলে উড়ে আসছে তারই দিকে মুখ করে। তার শ্বেতশুভ্র দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আলো প্রতিস্থত হয়ে ঠিকরিয়ে আসছে এবং তার পিঠ থেকে ঝকঝকে রূপালি দুটি ডানা ছন্দিত ভঙ্গিতে ওঠানামা করছে। এই হল সেই উড়ন্ত ঘোড়া পেগাসুস।

পেগাসুসের দিকে বেলেরোফোন হতবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে ভাবতে লাগল সে, এই বন্য ঘোড়াকে কিভাবে লাগাম দিয়ে বাঁধা যাবে। ঘোড়াটি ধীরে ধীরে তার নাগালের

মধ্যে এসে গেল। সে তখুনই লাগামটি পেছনে ধরে ঘোড়াটির দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। বেলেরোফোনকে কাছে আসতে দেখে পেগাস্সুস চিঁ-হিঁ-হিঁ আওয়াজ করে মাথাটা তুলে নিল। তারপর রূপালি ডানাদুটো তার ছড়িয়ে দিল নক্ষত্রখচিত আকাশে। বেলেরো-ফোনকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে আকাশে ঘুরতে লাগল। বেলেরো-ফোন বুঝল এই উড়ন্ত ঘোড়াটিকে লাগাম দিয়ে বাঁধা অসম্ভব ব্যাপার। ক্রমশ ঘোড়াটি ওপরে উঠে যাচ্ছে, সে নীচে না এলে তো আর তার নাগাল পাওয়া যাবে না। অল্পক্ষণ পর তার নজরে পড়ল পেগাস্সুস বৃত্তাকার পথ থেকে নীচের দিকে মুখ ঘুরিয়ে উড়ে আসছে আবার তার দিকে। জলাভূমির পাশে একই জায়গার দাঁড়িয়ে সে লাগাম হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। বেলেরোফোন নিশ্চিত ছিল সে মিনার্ভার দেওয়া যাদু-লাগাম কাজে লাগাতে পারবে—দেবীর দেওয়া লাগামের মহিমায় সে নিশ্চয়ই ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বেলেরেফোনের হাতে লাগামটি দেখেই ঘোড়াটি মাথা বেঁকিয়ে পিছিয়ে গেল কিন্তু মিনার্ভার সোনার লাগামটিকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বেলেরোফোনের কাছে ধরা দিল সে; নিজেই তার মুখটাকে লাগামের ফাঁসের মধ্যে নাক বেঁকিয়ে ঢুকিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে পেগাস্সুসের পিঠে উঠে লাগাম আলগা করে ধ'রে বেলেরোফোন আকাশে পাড়ি দিল। চাঁদের পাশ দিয়ে, নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতর দিয়ে পেগাস্সুস ডানা মেলে কেশর নাড়িয়ে ছুটে চলল দুরন্ত গতিতে। বেলেরোফোন পেগাস্সুসকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল এবং তার পিঠের দুদিকে নিজের পা-দুটোকে শক্ত করে চেপে থাকল। পেগাস্সুস মিনার্ভার সোনালী লাগামের গুণে ধীরে ধীরে বেলেরোফোনের অনুগত হয়ে চলতে লাগল। বেলেরোফোন সম্পূর্ণভাবে পেগাস্সুসকে তার নিয়ন্ত্রণে আনল।

আকাশের এত উঁচুতে উঠেছিল পেগাস্সুস যে বেলেরোফোন তার পিঠ থেকে পৃথিবীর নীচে আনাচে-কানাচে সব জায়গা ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিল। আকাশপথে চলতে চলতে বেলেরোফোন দেখতে

পেল নীচে এক জায়গার এক ভয়ঙ্কর আকৃতির দানব তার গুহার কাছে ঘোরাফেরা করছে। বেলেরোফোন এই ধরনের জন্তুকে জীবনে দেখে নি। এর মাথাটা সিংহের কিন্তু গলাটা ছাগলের, তার পিঠটা বড় বড় আঁশে ভ ত এবং তার লেজে অসংখ্য বর্শার ফলক। যখন জঙ্গলে সে তার লেজ ঘোরায় বাঁই বাঁই করে তখন চারিদিকের গাছের ডালপালা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে অবিরাম আগুনের কুণ্ডলী বেরিয়ে আসে। চারিদিকে মাটি পুড়ে ঝলসে যায়। অসংখ্য মানুষ ও জন্তু যারা তার শিকার হয়েছে তাদের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে মারিয়ে একাকার করে দেয় সে। এই কিম্ভূত-কিমাকার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ক্ষমতাশালী দানবটাকে দেখেই বুঝতে পারল বেলেরোফোন এই সেই কিমেরা।

পেগাসুসকে ইঙ্গিতে ঈশারা করে তাকে নিয়ে শূন্যে ভেসে শোঁ করে নীচে নেমে এল সে কিমেরার মাথায় পিছনে। কিমেরার মুখের আগুনের নাগালের বাইরে গিয়ে বেলেরোফোন তরবারির ঘা দিল তার পিঠে। সেই দানবটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বেলেরোফোনের দিকে তাক করে কিছুটা উপরে উঠে আবার পড়ে গেল। ততক্ষণে বেলেরোফোন পেগাসুসকে নিয়ে আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। বেলেরোফোন কয়েক মুহূর্ত পরেই পেগাসুসকে নিয়ে উড়ে এসে নীচে কিমেরার পিঠে আবার তরোয়ালের কোপ দিয়ে তার নাগাল থেকে মুহূর্তে উপরে উঠে গেল। এইভাবে বারে বারে তরবারির ঘা দিতে দিতে যখন রক্তে ভেসে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে গেল কিমেরা, তখন বেলেরোফোন তার গলায় কোপ দিল সজোরে।

তখন দানবটা চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। উন্মত্ত হয়ে গিয়ে আশেপাশে যা পেল তা আছড়িয়ে মাড়িয়ে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে টলতে টলতে দুম করে পড়ে গেল শেষে মাটিতে। আর উঠতে পারল না। রাজা আইবেটোস সে খবর পাওয়ামাত্র বেলেরোফোনকে সাদরে
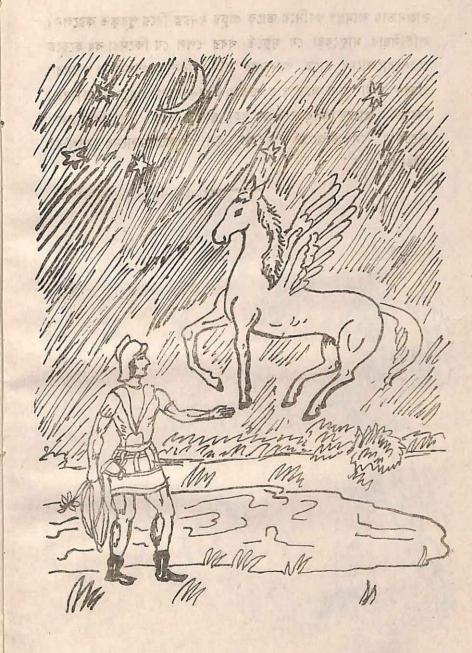
রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। লাইসিয়ার মানুষেরা যে মুহূর্তে খবর পেল যে কিমেরা বধ হয়েছে বেলেরোফোনের হাতে, আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকল না তাদের। চব্বিশ ঘণ্টা আর আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাতে হবে না তাদের। কিমেরা তাদের জীবনে এক মহা দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। অবশেষে সে দুঃস্বপ্নের অবসান হল বেলেরোফোনের সগৌরব কৃতিত্বে।